৭ই পৌষ ১৩৬৫

শ্রীমতী কমলা রায়

প্রকাশক : শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৯৭সি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা ২৬

মুদ্রক : শ্রীসিদ্ধার্থ মিত্র
বোধি প্রেস
৫ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬

লেখকের নিবেদন

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মহিলা সদস্যা ও সদস্যবৃন্দ আজ যে সম্মানের গৌরবে আমাকে ভূষিত করে এখানে এনে বসিয়েছেন তার জন্য আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি; কিন্তু অন্তরের সঙ্গে নয়; কেননা যোগ্য ব্যক্তিকে তাঁরা নির্বাচন করেন নি। আমার দৈন্য তো আমি জানি। আমার সেই দৈন্য এবং অযোগ্যতাই সমবেত সুধীবৃন্দের সামনে উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যে আমার স্কন্ধে ক্ষমতার বাইরে এক গুরুভার চাপিয়ে আমাকে আজ এখানে এনে বসানো হয়েছে।

১৯২৮ সালের দোলের দিনে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদক বন্ধুবর সোমেনবাবু কয়েকজন বন্ধু নিয়ে শান্তি-নিকেতনে আমার বাড়িতে এসে হানা দেন। প্রথমে ভেবে-ছিলাম তাঁরা বুঝি আবির খেলতে এসেছেন, কিন্তু তা নয়; তাঁরা এসে তার চাইতেও এক বড় আঘাত আমার প্রতি হানলেন। সেদিন সোমেনবাবুদের দাবি ছিল যে, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত দীনবন্ধু এণ্ডরুজ স্মারক বক্তৃতামালার পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমাকে "শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ" বিষয়টির উপর লিখিত ভাষণ পড়তে হবে, প্রয়োজন হলে demonstrateও করতে হবে।

জীবনে আমি কখনও শিক্ষকতা করিনি। রবীন্দ্রনাথের

শিক্ষা-দর্শন প্রসঙ্গে আমার একেবারে কোনো অভিজ্ঞতা নেই — সেক্ষেত্রে সমবেত সুধীজনের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু লিখে নিয়ে পড়া আমার পক্ষে যারপরনাই ধৃষ্টতা প্রকাশ হবে। এই মনে করেই তাঁদের অন্য কোনো যোগ্যতর ব্যক্তির কাছে যেতে অনুরোধ করেছিলাম; যিনি কিনা হবেন একজন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ।

আমার প্রস্তাবের উত্তরে সোমেনবাবু আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে, তাঁরা কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদের তত্ত্ব এবং তথ্যবহুল গাম্ভীর্যপূর্ণ academic ভাষণ চান না। তাঁরা চেয়েছিলেন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের সব ঘরোয়া গল্প শুনতে,—কেমন করে তিনি পড়াতেন, কেমন ভাবে ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন, পড়া না পারলে কেমন করে তিরস্কার করতেন এবং কি করে লেখাপড়ার নূতন নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করতেন, ছেলেদের সঙ্গে মিলে মিশে অভিনয় করতেন, অভিনয় শেখাতেন—এই সব শ্রুতিমধুর কাহিনী; আর সেই সব কাহিনী তাঁরা শুনতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের এমন একজন ছাত্রের কাছ থেকে যিনি কিনা দীর্ঘদিন ধরে তাঁর পাদমূলে বসে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

একথা খুব সত্যি যে, গুরুদেবের পাদমূলে বসে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য আমার একসময় হয়েছিল। তাঁরা আমার সম্মতি জোর করে আদায় করে নিয়ে চলে গেলেন।

এই গুরুদায়িত্ব বহন করবার মতো আমার কী পরিচয়

আছে ? আমি সাহিত্যিক নই, বক্তা নই, অধ্যাপক নই, নই কোনো রাষ্ট্রীয় দলের প্রতিনিধি। আমার একটি ছোট্ট পরিচয় হচ্ছে যে, ১৯১০ সালে মাত্র আট বছর বয়সে রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র হয়ে প্রথম শান্তিনিকেতনে আমি এসেছিলাম।

সেই থেকে স্বল্পকম দীর্ঘ সত্তর বছরকাল আমি এখানকার অধিবাসী। এই আশ্রমবিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হিসেবে গুরুদেবের কাছে পাঠ নেবার এবং আশ্রমপরিবারভুক্ত হয়ে গোষ্ঠীপতি রবীন্দ্রনাথকে নিতান্ত ঘরোয়া ভাবে কাছে পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই দীর্ঘদিন এখানে বাস করার ফলে এখানকার প্রতিটি ঘর, ভবন, বৃক্ষ, রাস্তার সঙ্গে আমার নাড়ীর সম্বন্ধ। প্রাক্তন আশ্রমবাসী মাত্রই আমার অতি প্রিয়। এই জন্য আশ্রমের বহুদিনের স্মৃতিবিজড়িত কোনো ঘর ভাঙার অথবা গুরুদেবের স্নেহধন্য অমূল্য কোনো বৃক্ষ ছেদনের সংবাদ শুনলে আমি অন্তরে যারপরনাই বেদনা অনুভব করি ; দুঃখে এবং ক্ষোভে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ি। আমার এই সামান্য পরিচয়টুকুর উপর নির্ভর করেই আজকের এই মহতী সভার উদ্যোক্তারা আমাকে এখানে এনে বসিয়েছেন। জানিনা উপস্থিত সুধীবৃন্দ যা চাচ্ছেন সেটা আমি ঠিক পূরণ করতে পারব কিনা।

কালীপদ রায়

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

আমাদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিধাতার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এই জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর সৃষ্টিতে, তাঁর কর্মে যে মহত্ত্ব অর্জন করেছিলেন আমরাও তার গৌরবের ভাগী হয়েছি— আবার তাঁর নিকট প্রতিবেশী হয়ে তাঁকে খুব কাছের মানুষ বলে প্রতিদিনের পরিচয়েও জেনেছি। তিনি ছিলেন বিচিত্র বিদ্যার অধিকারী। উত্তরাধিকার সূত্রে এবং নিজের চেষ্টায় ধ্যান ও সাধনার দ্বারা অর্জিত বিচিত্র বিদ্যাকে তিনি ছাত্রদের মধ্যে দান করে বিদ্যা-অর্জনের সার্থকতা লাভ করতে চেয়েছিলেন। প্রথম যৌবনেই তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার অসারতা অনুভব করে বিদ্যা দানের যে বাসনা তাঁর অন্তরে জাগরুক হয়েছিল তার ফলেই শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। বিশ্বভারতী স্থাপনে গুরুদেবের মূল উদ্দেশ্য ছিল—'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্'—শিক্ষার ক্ষেত্রে 'দিবে আর নিবে' এই ছিল তাঁর আদর্শ। সবদিক থেকে বিদ্যার্থীর মধ্যে মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ করে তোলাই ছিল তাঁর বাসনা।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র শিক্ষা অর্জন

নিজেকে অত্যন্ত বিনয় সহকারে রবীন্দ্রনাথ একজন ইস্কুল-পালানো ছেলে বলে প্রচার করেছেন একাধিক লেখায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জমা-খরচের খাতার হিসেব অনুযায়ী দেখতে পাই যে ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে তিনি ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমিতে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু স্কুলের শিক্ষা ঐ অল্প বয়স থেকেই তাঁর ধাতে সইল না। চার থেকে চোদ্দ বছর বয়সে তিনি ক্রমান্বয়ে ছটি স্কুল পরিবর্তন করেছিলেন। কোনো স্কুলই তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি, সবই তাঁর মনে হত চাইল্ডস্ স্লটার হাউস। শিশুচিত্তের বিকাশের অন্তরায়গুলি তাঁর অন্তরকে পীড়িত করত। এর উপরে ছিল শিক্ষকদের কটূক্তি ব্যঙ্গোক্তি আর নির্দয় প্রহার। বড় ছেলেদের অত্যাচারও ছিল।

এদিকে বাড়িতে সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ বিচিত্র শিক্ষার আয়োজন করেছেন। তিনি নিজে ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি। কিন্তু মনে হয় তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগও রবীন্দ্রনাথ বেশি নিতে পারেন নি। ইতিমধ্যে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী এবং নর্মাল স্কুল তাঁর পরখ করা হয়ে গেছে। ১৮৬৮ থেকে ১৮৭১-র মধ্যে বেঙ্গল একাডেমিতে দু বছর পড়ার পর ১৮৭৩ সালে বার বছর বয়সে তাঁর উপনয়নের পরেই পিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতন ও হিমালয় ভ্রমণে গেলেন। তখনই দেবেন্দ্রনাথের কাছে ইংরেজি সংস্কৃত এবং মুখে মুখে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, উপনিষদের মন্ত্র মুখস্থ করেছিলেন। কিন্তু ঐ বছরের জুন মাসে কলকাতায় ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ আবার বেঙ্গল একাডেমিতে—ফিরিঙ্গিদের স্কুলে যেতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৪

সালে আবার স্কুল বদল। এবার সেণ্ট জেভিয়ার্স। সেখানেও শেষ পর্যন্ত কোনো ফল না হওয়ায় স্কুলের পালা শেষ করে বাড়িতেই পড়াশুনার আয়োজন। স্কুলের শাসনের অভিজ্ঞতাই বালক রবীন্দ্রনাথকে বেত হাতে রেলিং-ছাত্রকে পড়াবার খেলায় নামিয়েছিল—অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার একটা reflection বলা যায়।

তারপর তাঁর শিক্ষার যে আয়োজন চলল তা রবীন্দ্র-জীবনীর সকল পাঠকেরই জানা। দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে সাহিত্যপাঠ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে গান অভিনয় নাটক রচনার শিক্ষানবীশী, বিলেত যাবার আগে সত্যেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা—সব মিলিয়ে একটা স্বশিক্ষার আয়োজন।

১৮৭৮ সালে বিলেতে ব্রাইটন পাবলিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়তে সুযোগ পেয়েছিলেন অধ্যাপক হেনরি মর্লির কাছে। ভাল করে কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেলেন ভালো পড়ানো কাকে বলে। পড়ার বস্তুর সঙ্গে মানুষের মন মিশলে যে তা কত সত্য ও সজীব হয়ে ওঠে তা যেন তিনি অনুভব করতে পারলেন। লিখেছিলেন :

> আমি তখন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে ভরতি হয়েছি, ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেনরি মর্লি। সে তো পড়ার বই থেকে চালান দেওয়া শুকনো মাল নয়। সাহিত্য তাঁর মনে, তাঁর

গলার সুরে প্রাণ পেয়ে উঠত—আমাদের সেই মরমে পৌঁছত যেখানে প্রাণ চায় আপন খোরাক। (ছেলেবেলা)

‘ছেলেবেলা’য় আরও লিখেছেন যে লেখাপড়া শেখার কারখানা-ঘরটাকে তিনি দৈবক্রমে এড়াতে পেরেছিলেন। তাঁকে তরিয়ে দেবার কাজে মাস্টার পণ্ডিত যাঁদের রাখা হয়েছিল তাঁরা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মর্লি সাহেবের পড়ানো পছন্দ হল। অনেককাল পরে স্মৃতিচারণ করতে বসে বলেছিলেন, “হেনরি মর্লির মত শিক্ষক পাওয়া আমার জীবনের বড় একটা সৌভাগ্য। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি ছিল নূতন ধরনের। তিনি কখনো শব্দের অর্থ করে করে পড়াতেন না। পাঠ্য বিষয় তিনি ক্লাসে এমন ভাবে আবৃত্তি করে যেতেন যাতে করে তার বিষয়-বস্তু বুঝতে আমাদের কষ্ট হত না। তাঁর আবৃত্তির মধ্যেই তিনি যা বোঝাতে চাইতেন তা পরিষ্কার ফুটে উঠত। আমরা তারপরে বই নিয়ে ঘরে বসে আলোচনা করতুম, নিজেরাই নিজেদের শিক্ষা দিতুম।” (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ)

দিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন যে হেনরি মর্লির মত শিক্ষক এদেশে একজনকেই তিনি মনে করতে পারেন, তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

শিক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষার সূত্রপাত

প্রথম যৌবনে পিতার নির্দেশে জমিদারী পরিচালনার জন্যে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে বাস করতে গেলেন। তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ল নিজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিশুকাল থেকেই স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতির উপর যার পর নাই তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল, সেই সব স্কুলে তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের পাঠাতে তাঁর মন সায় দিল না। তিনি তাঁর গৃহ বিদ্যালয়ের জন্য জনকয়েক শিক্ষকও জোগাড় করলেন। ইংরেজি শেখাবার জন্যে একজন ইংরেজকে পেলেন, নাম লরেন্স, সংস্কৃত পড়াতে আনলেন শিবধন বিদ্যার্ণবকে, গণিত ও বিজ্ঞানের জন্য জগদানন্দ রায়। তখন তিনি একাধিক বিদেশী পত্রিকার গ্রাহক। তা থেকে নিজে বিজ্ঞানের কথাগুলি সংকলন করে জগদানন্দ রায়কে দিতেন বাংলায় অনুবাদ করে রথীন্দ্রনাথকে শেখাবার জন্যে। এমনি করে শুধু ছাত্র নয়, তিনি গৃহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও নিজের ইচ্ছামত গড়ে-পিটে নিতেন।

নিজের সুখের জীবন ছেড়ে তিনি সব রকম আরাম বিসর্জন দিয়ে যে বিদ্যালয় গড়তে বসলেন তার কারণগুলি তাঁর নানা লেখায় ছড়িয়ে আছে। দেশের প্রচলিত শিক্ষাবিধির উপর গভীর বিতৃষ্ণা, নিজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটে এবং সকল ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে এমন শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ তাঁকে এই কাজে প্রবুদ্ধ করেছিল।

নানা কারণে ১৯০১ সালের শ্রাবণে শিলাইদহবাস সমাপ্ত করে রবীন্দ্রনাথ এলেন শান্তিনিকেতনে। এ শান্তিনিকেতন তাঁর অজানা নয়। অনেকদিন ধরেই আসা-যাওয়া তো চলছিল। সেই কোন কিশোর কালে খোয়াইয়ে ঘুরে ঘুরে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়ানো আর নারকেল গাছের ছায়ায় বসে পৃথিরাজের পরাজয় নিয়ে কাব্য লেখা। শান্তিনিকেতনেই যে জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সে কথা উল্লেখ করে পরে বলেছিলেন, "এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তালশ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জে শ্যামল শান্তি স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।"

শিলাইদহের বিকল্প হিসাবে তিনি শান্তিনিকেতনকেই মনে মনে বেছে নিয়েছিলেন। মনের মধ্যে তপোবনের রূপকল্পনাও চলেছে। ইতিপূর্বে তাঁর চল্লিশ বছরের জীবনে দেশাত্মবোধ ও ঔপনিষদিক অধ্যাত্মচেতনা বেশ গভীর শিকড় গেড়ে বসেছে। নৈবেদ্য কাব্যে তার এক সুসংহত শিল্পরূপায়ণ দেখা গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কর্মপ্রেরণাও তাঁকে শুধু কাব্যরচনায় তৃপ্ত থাকতে দেয়নি। একদিন "আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম, শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তা হলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন।" অনুমতি মহর্ষিদেব দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শও দিলেন

এই বলে যে শিক্ষকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনোই অভিজ্ঞতা নেই সুতরাং তিনি যদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের নামকরা অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে তাঁদের অধ্যাপনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন তাহলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শিক্ষণ ব্যাপারে অনেক সুরাহা হবে বলে তিনি মনে করে। পিতৃ-আজ্ঞা তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছুদিন ঘোরাফেরা করলেন বটে কিন্তু তিনি যা চাচ্ছিলেন সেখানে ঠিক সেই জিনিসটি পেলেন না।

ইতিমধ্যে তাঁর মনে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের রূপটি স্পষ্ট না হোক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনটি সুনির্দিষ্ট কারণসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। স্বার্থচেষ্টা ও আড়ম্বর থেকে শিক্ষাপদ্ধতিকে মুক্ত করতে হবে, অসংযত প্রবৃত্তি ও বিলাসবাহুল্য আমাদের ভ্রষ্ট করছে, দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করতে পারছি না তাই দৈন্য আমাদের পরাভূত করছে—এই কথাগুলি মনে রেখেই বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা। আচার্য জগদীশচন্দ্রকে তাই লিখেছিলেন, "একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে। গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।" (চিঠিপত্র ৬, পত্র ১৭)

শিক্ষাসংক্রান্ত তাঁর এই নতুন পরীক্ষা সুরু হবার মুখেই এক অসামান্য পুরুষের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। তিনি উপাধ্যায়

ব্রহ্মবান্ধব। তিনি নিজেই ইতিপূর্বে কলকাতায় প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের কথা মনে রেখে একটি স্কুল সুরু করেছিলেন। তিনি যোগ দিলেন তাঁর ছাত্রদের শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসে। সঙ্গে এলেন শিষ্য রেবাচাঁদ। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ আর তার কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ।"

ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনা হল ১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর, বাংলা ৭ই পৌষ ১৩০৮। সেদিন তাঁর কী স্বপ্ন ছিল, কীরকম মানুষ গড়ে তোলার বাসনা ছিল তাঁর, তা তাঁর প্রথম অভিভাষণ থেকে কিছু উদ্ধৃত করলেই স্পষ্ট হবে। শিক্ষক হিসেবে তাঁর কাজের একটা ধারণা তাঁর মনের মধ্যে ছিল, তাই বলেছিলেন, "তোমরা আমার কাছে এসেছ—আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব—আমাদের ব্রহ্মপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান করুন।"

ডিসেম্বর মাসে সূচনা হলেও ১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ের অধ্যয়নের কাজ সুরু হয়। সূচনার পাঁচটি বালকের সঙ্গে পরে এসে যোগ দিয়েছিলেন পাঁচ বছরের শমীন্দ্রনাথ, কবির কনিষ্ঠ পুত্র। শিক্ষকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ রায় ও শিবধন বিদ্যার্ণব।



নূতন শিক্ষক এলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং তাঁর সিন্ধুদেশীয় শিষ্য রেবাচাঁদ। তিনিও ছিলেন উপাধ্যায় মশায়ের মত সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস জীবনে স্বামী অণিমানন্দ নামে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। তিন মাস পরে হেডমাস্টার হয়ে এলেন আর একজন শিক্ষক চুঁচুড়ানিবাসী মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্র পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ঠিক মত পাওয়া ও গড়ে নেওয়ার কথাটাও রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে দেখা গেল যে শুধু অধ্যয়ন নয়, ছাত্রদের জীবনের সকল বিষয়েই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সজাগ। তাদের থাকা খাওয়া, চলাফেরা, আচার-ব্যবহার সবই যেন ভদ্র হয়, বিলাসী না হয়, তার জন্যে তাঁর কত ভাবনা চিন্তা। ছাত্রদের জন্য যেমন তাঁর সহানুভূতি তেমনি প্রথম দিকে আশ্রম-জননী রূপে অনেক দায় দায়িত্ব নিজের উপর তুলে নিয়েছিলেন কবি-পত্নী মৃণালিনী। সেই সময়কার কথা তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন জগদানন্দ রায় :

> এখন যেমন সকাল সন্ধ্যায় ছেলেরা উপাসনা করে এবং খালি পায়ে থাকে, বিদ্যালয়ের আরম্ভের দিন থেকে তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রত্যেকের একখানি চেলির কাপড় ও চাদর থাকিত, তাহা পরিয়া ছেলেরা উপাসনায় বসিত। আহারের সময় প্রত্যেকে গাড়ুভরা জল লইয়া আহারের স্থানে যাইত। বলাবাহুল্য পট্টবস্ত্র, গাড়ু, থালাবাটি সকলই গুরুদেব দিতেন। অনেক ছাত্রের বিছানাও বিদ্যালয় হইতে

দিতে দেখিয়াছি। তখন কোনো ছাত্রের নিকট হইতে নিয়মিত কোনো বেতন লওয়া হইত না।

অনেকের মধ্যেই এরকম ধারণা এখনও দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথ শুধু খেয়াল বশেই এই বিদ্যালয়ের কাজে নেমেছিলেন। ঠাকুর পরিবারের জমিদারীর জোর ছিল পিছনে, অর্থের জন্য ভাবতে হয়নি। এ ধারণা যে কত অসত্য তা বলা যায় না। তিনি নিজেই পরে লিখেছেন,

তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল; সে দেনা আমার সম্পূর্ণ স্বকৃত নয়, কিন্তু তার দায় আমারই একলার। দেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ অতি সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রীর কিছু কিছু সওদা করে অসাধ্য সাধনে লেগে গেলাম।

জগদানন্দের রচনায় রবীন্দ্রনাথের যে ছবি ধরা আছে তা দেখলে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হবে।

এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুদেব বৎসরের পর বৎসর প্রায় সময়ই ছেলেদের সঙ্গে থাকিতেন। রাত্রিতে ছেলেদের পড়াশুনার পাট ছিল না। ছেলে অল্প ছিল, ক্লাসেই আমরা তাহাদের পড়শুনা শেষ করাইয়া দিতাম। সন্ধ্যায় গুরুদেব ছেলে ও অধ্যাপকদের লইয়া পুস্তক পাঠ গল্প ও নানা রকম খেলা করিতেন। সে এক আশ্চর্য সান্ধ্য

সম্মিলন ছিল। আমরা ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম। বলা বাহুল্য গুরুদেবই এই সম্মিলনের নেতা ছিলেন। প্রত্যেক দিনই তিনি কি প্রকারে নূতন নূতন বিষয় লইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন, আমরা ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। বৎসরের পর বৎসর এই সান্ধ্য সভায় উপস্থিত থাকিয়াছি—কোনো-দিনই তাঁহাকে ক্লান্ত দেখি নাই। আজকাল যাহাকে sense training বলা হয়, গুরুদেব আমাদের বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যে প্রথমে তাহার সূত্রপাত করেন। একটা জায়গায় কতকগুলি কড়ির স্তূপ রাখা হইত, বালকগণ আন্দাজে তাহার সংখ্যা বলিয়া দিত। একটা পাত্রে আট দশ রকম জিনিস রাখা হইত, ছাত্রেরা এক নজরে দেখিয়াই সেগুলির বিবরণ লিখিয়া দিত।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের নেতৃত্বে এই সান্ধ্য সম্মিলনটি পরবর্তীকালে আশ্রমবিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'বিনোদন পর্বে'র রেখাপাত করে। গুরুদেবের শিক্ষাব্যবস্থায় গান ও অভিনয়ের একটা বড় অংশ গোড়া থেকেই ছিল। এই সময়ে অভিনয় যে ছিল না তা বলা যায় না। এখনকার লাইব্রেরী ঘরে ছেলেরা হেঁয়ালি নাট্যের অভিনয় করত। গুরুদেবই অভিনয় শিক্ষা দিতেন এবং তার ব্যবস্থাও করতেন। নতুন নতুন গান বেঁধে তাতে সুর দিয়ে এই সময় ছেলেদের এবং অধ্যাপকদের নিজেই শিখিয়ে দিতেন। "মোরা

সত্যের পরে মন" এই গানটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যেই লিখে তাতে সুর দিয়ে আশ্রমবাসী সকলকে শিখিয়েছিলেন।

এই গানটি ১৯১১ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আশ্রমসঙ্গীত হিসেবে উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিতে গাওয়া হত। ১৯১১ সালে 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি লেখা হয়। তখন থেকেই এই গান আশ্রমবিদ্যালয়ের আশ্রমসঙ্গীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এছাড়াও গুরুদেব রোজ দুই তিনটি ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃত ক্লাসে নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দিতেন এবং ছেলেদের ইংরেজি ও বাংলা কবিতা আবৃত্তিও শেখাতেন।

১৯০২ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রসংখ্যা ছয় থেকে বারোতে গিয়ে দাঁড়াল। এই সময় রথীন্দ্রনাথের সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার আশ্রমবিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হন। এই দুই বন্ধু ছিলেন আশ্রমের ছাত্রদের মধ্যে সব চেয়ে বড়। আর আবাসিক ছাত্রদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের ভাইপো অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সহপাঠী ছিলেন শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি অরুণপ্রকাশের সমবয়সী অথবা কয়েক মাসের ছোট। শান্তিনিকেতনে আসার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অরুণপ্রকাশ লিখছেন :

আমি শুধু জানিতাম উপাধ্যায় মহাশয় আমার জ্যাঠামহাশয়। তিনিও হয়ত আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন যে এই শিশুকে যথার্থ শিক্ষার জন্য পারিবারিক বন্ধভূমি

হইতে সরাইয়া আনিয়া শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রশস্ত ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দেওয়া তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ কর্তব্য। তাই একদিন বর্ষাকালে সন্ধ্যার কিছু পরেই উপাধ্যায় মহাশয়ের হাত ধরিয়া আমি মাত্র ছয় বছর বয়সে আশ্রমে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। বেশ মনে পড়ে তখন আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ ছড়াইয়া থাকিলেও জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ কিরণে ব্রহ্মচর্য আশ্রম পুলকিত হইতেছিল। আশ্রমের সম্মুখে মাত্র জনকয়েক ছাত্র ও শিক্ষক পরিবেষ্টিত হইয়া গুরুদেব গান গাহিতেছিলেন। আমি জ্যাঠামশায়ের হাত ছাড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গুরুদেবকে দেখিতে লাগিলাম।

এই শিশু ছাত্রদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কীরকম সজাগ সস্নেহ দৃষ্টি ছিল সে কথাও অরুণপ্রকাশ লিখে রেখে গেছেন। প্রত্যেকটি ছাত্রের প্রতি তাঁর নজর থাকত এবং তাদের কাছে টেনে তাদের মন বোঝবার চেষ্টা কেমন করে করতেন তা অরুণপ্রকাশের সাক্ষ্য থেকেই জানা যাবে।

মনে পড়ে সকাল বেলায় স্নান সারিয়া চেলির বস্ত্র পরিয়া, আসন পাতিয়া, আমরা প্রত্যেকে পৃথক ভাবে একেকটি গাছের তলায় অথবা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রার্থনা করিবার জন্য বসিতাম। আমি তো প্রার্থনা করিতে জানিতাম না, নিজের কথাই চিন্তা করিতাম। কখনও বা বাড়িতে মায়ের কাছে আমার মন চলিয়া যাইত এবং আমার সমস্ত অভাব তাঁহাকে মনে মনে জানাইতাম। যখন দেখিতাম অন্যান্য

সাথীরা প্রার্থনা জানাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে তখন চক্ষের জল ভাল করিয়া মুছিয়া আমিও ফিরিয়া আসিতাম। একদিন এই অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছি দেখি গুরুদেব দাঁড়াইয়া আছেন। আমি কাছে যাইতেই গুরুদেব আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কী প্রার্থনা করিলাম? তিনি কিরূপ উত্তরের আশা করিয়াছিলেন জানি না, আমি কিন্তু অবাক হইয়া তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। বোধহয় আমার উত্তর দেওয়া হইয়াছিল।

তাহার পর অবসরমত সেই দিন তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন ও একটি আলমারী হইতে বৃহৎ এক পুস্তক বাহির করিয়া, খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া, একখানি বড় কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে গায়ত্রীমন্ত্র লিখিয়া আমাকে দিয়াছিলেন এবং আমি মুখস্থ করিতে পারিব কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তার-পর অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি আমাকে সেই মন্ত্রটি মুখস্থ করাইয়াছিলেন এবং তাহার অর্থ বুঝাইয়াছিলেন। আমি তাহা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবাক হইয়া শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে বয়সে অর্থের চেয়ে মন্ত্রের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল বেশি। তখন হইতে প্রার্থনার সময় গায়ত্রীমন্ত্র আমি অনবরত আবৃত্তি করিতাম।

ছাত্রদের মনের কথা ও ব্যথা রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই এমনি

করে বুঝে নিতেন। শুধু ক্লাসের পড়ানোয় তাঁর শিক্ষাদান আর কতটুকু, ছাত্রদের সমস্ত দিনের খুঁটিনাটি—যতদিন আশ্রম-বিদ্যালয় ছোট ছিল ততদিনই—তিনি সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ করতেন।

আশ্রম সুরু করার অল্পকালের মধ্যেই অপ্রত্যাশিত সব ঘটনার উদ্ভব হল। উপাধ্যায় মহাশয় এবং তাঁর সহকর্মী রেবাচাঁদ আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন। কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন আশ্রমজননী কবিপত্নী মৃণালিনী। তাঁকে নিয়ে কলকাতায় চলে যেতে হল রবীন্দ্রনাথকে। সেবা শুশ্রূষা চলছে—কলকাতায় তখনও বিদ্যুৎ প্রচলন হয়নি ঘরে ঘরে—সারা রাত তালপাতার পাখা দিয়ে মুমূর্ষু স্ত্রীর পরিচর্যা চলছে, অন্যদিকে আশ্রমের তদানীন্তন কার্যাধ্যক্ষ কুঞ্জ ঘোষকে কুড়ি পৃষ্ঠা ব্যাপী চিঠি লেখা চলছে। স্ত্রী-বিয়োগের দশদিন আগে চিঠিখানি শেষ হয়। কী দারুণ বিপদের মধ্যে এই চিঠি লেখা হয় তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। অনেকে এই চিঠিখানিকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম কনষ্টিটিউশন বলে মনে করেন। নির্দেশ অনেক থাকলেও এ কথা রবীন্দ্রনাথ ঐ চিঠিতে স্পষ্টই লিখেছেন, "আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন।"

সেই চিঠির কোনো কোনো বিষয় এখানে উল্লেখ করা

অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের মন বুঝতে তা সাহায্য করবে।

> প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিস দিতেন যাহা গুরু-শিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দান প্রতিগ্রহ হইতেই পারে না। ছাত্রদের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে শিক্ষক যথেষ্ট পাওয়া যায় কিন্তু গুরু সহজে পাওয়া যায় না। এই জন্য লক্ষের প্রতি দৃষ্টি রেখে ধৈর্যের সঙ্গে সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হবে। ১৯১২ সালে অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

> যে লোক সকলকে ডাকিবে, টানিবে, বাঁধিবে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। উদারভাবে চিন্তা, ব্যাপকভাবে প্রীতি ও বলিষ্ঠভাবে কর্ম করিবার আদর্শ বহন করিয়া গুরু আসুন—ততদিন কেবলই সঙ্কোচের আবরণে আবৃত হইয়া দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া ব্যর্থ দিন কাটাইয়া চলি।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষা স্বদেশীয় ভাব ধারণা ও জীবন সম্পর্কে ছাত্রদের শ্রদ্ধাবান করে তুলবে এ কথাও রবীন্দ্রনাথ কুঞ্জলাল ঘোষের কাছে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন। এ কথাও

বলেছিলেন যে বিশ্বজনীনতার আদর্শে উত্তীর্ণ হতে হলে প্রকৃতির পূর্ণতার মধ্য দিয়েই হতে হবে।

স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা—এমন কি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনও সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রাকৃতিক পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয়কে লেখা চিঠিটি পরিশিষ্টে সংলগ্ন করা গেল। সেই চিঠিটি প্রমাণ করবে বড় বড় আদর্শ ও ছোট ছোট দৈনন্দিন আচারগত নির্দেশ সমমূল্যে আলোচিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরে।

১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হল। ১৯০৩, সেপ্টেম্বর মাসে মারা গেলেন মধ্যমা কন্যা রেণুকা দেবী। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাঘী পূর্ণিমার দিনে লোকান্তরিত হলেন আশ্রমবিদ্যালয়ের আদর্শ শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়। রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছিলেন “আশ্রমের যাঁরা শিক্ষক হবেন তাঁরা মুখ্যত হবেন সাধক।” তাঁর সেই কল্পনা সত্য হয়েছিল সতীশচন্দ্রের মধ্যে। গুরুদেব নিজেই লিখেছেন, “এখানে ছাত্রদের সহজ মুক্তির আনন্দ দিয়েছি। সর্বদা তাদের

সঙ্গী হয়ে ছিলাম—মাত্র দশটা পাঁচটা নয়—শুধু তাদের নির্দিষ্ট পাঠের মধ্যে নয়—তাদের আপন অন্তরের মধ্যে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোনো নিয়ম দ্বারা তারা যাতে পিষ্ট না হয় এই আমার অভিপ্রায় ছিল। এই চেষ্টায় সঙ্গী পেয়েছিলুম কিশোর কবি সতীশচন্দ্রকে।” সতীশচন্দ্রের স্মৃতি জীবনের শেষভাগেও কবির মনে সজীব ছিল। তারপর ১৯০৭ সালে মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে গেল কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথকে।

পরপর এই সব আঘাত সত্ত্বেও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে তাঁর অন্যমনস্কতা ছিল না। অন্য কোনো মানুষ এমন অবস্থায় ভেঙ্গে পড়ত, অভিশাপ দিত বিশ্ববিধানকে। কিন্তু তখনকার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জগদানন্দ লিখছেন—“উপর্যুপরি পারিবারিক বিপদ আসিতে লাগিল, এই সংকটকালে কিন্তু তাঁহাকে আমরা একটুও নিরুৎসাহ হইতে দেখি নাই।”

আশ্রমে তখন ছেলেদের যতগুলি বাসগৃহ ছিল গুরুদেব পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক বাসগৃহে থাকতেন—একথা জগদানন্দের রচনায় পাই। ছেলেরা কখনও উচ্ছৃঙ্খল হলে নিজের সঙ্গ দিয়ে, তাদের সঙ্গী হয়ে, তিনি তাদের শোধরাবার চেষ্টা করতেন। লাইব্রেরীর উপরকার দোতলা ঘরে—পরে গুরুদেব যার নাম দিয়েছেন বলভী কুটির—ছেলেরা যখন দুষ্টুমির মাত্রাটা বাড়িয়ে দিয়েছে তখন তাদের মনের গতি বদলাবার জন্যে তিনি একটি নতুন নাটক লেখা আরম্ভ করলেন। জগদানন্দ লিখছেন, “ছেলেদের মনোরঞ্জন করিয়া সংযত

রাখিবার জন্য এই ঘরে বসিয়া তিনি একখানি নাটক লেখা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিনে দিনে নূতন নূতন সুরে গান রচনা হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পরে সেখানে বসিয়াই ছেলেদের সেই সব গান শিখাইতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। আশ্রমে যে একটা থমথমে ভাব ছিল তাহা কাটিয়া গেল। ইহাই সেই সুপ্রসিদ্ধ শারদোৎসব নাটক।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদান কেবলমাত্র ক্লাসের মধ্যে সীমিত ছিল না। প্রতিদিন শেষরাত্রে ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে আরম্ভ করে রাত্রিতে শোবার ঘণ্টা পর্যন্ত ছেলেদের দৈনন্দিন নিয়মবরাদ্দ কাজ এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁকে থাকতে হয়েছে ছেলেদের সঙ্গে। প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতা ছিল। তিনি ছেলেদের সঙ্গে সমবেত উপাসনায় যোগ দিতেন, মন্দিরে উপদেশ দিতেন। বিকেলে ছেলেদের নিয়ে সাহিত্যের আলোচনা এবং নানারকম sense training-এর খেলা খেলতেন। ছাত্রদের সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করতেন। গান বেঁধে সুর দিয়ে ছাত্র শিক্ষক সবাইকে শেখাতেন। নাটক রচনা করে অভিনয় শিখিয়ে ছাত্র শিক্ষক সবাইকে নিয়ে নাট্যগোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন।

শিক্ষক যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরও যোগ্য হয়ে ওঠার ব্যাপারে তাঁর চিন্তা ভাবনার শেষ ছিল না। প্রথম যুগের শিক্ষকেরা তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে এবং নিজেদের সনিষ্ঠ সাধনায় অনন্য-চরিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের মধ্যে নিজেদের বন্ধ রাখলেও তাঁরা বাংলার সেরা শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য হতেন। রবীন্দ্রনাথের নিত্য উৎসাহ ও প্রেরণা তাঁদের অনেকেরই জীবনের সার্থকতার কারণ হয়েছিল। জগদানন্দ ও হরিচরণকে তো তিনিই জমিদারী সেরেস্তা থেকে মুক্ত করে শিক্ষকের সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। শুধু তাই নয় জগদানন্দ যে গ্রন্থগুলি রচনা করে বাংলা ভাষার জগতে স্থায়ী খ্যাতির আসন অধিকার করেছেন সেগুলির পরিকল্পনা ও পরিমার্জনা রবীন্দ্রনাথ নিজেই করে দিয়েছেন। একথা মনে রেখে জগদানন্দ লিখেছেন, "আমার আগেকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভাষা ভয়ানক জটিল ছিল। সহজ ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ে লিখিবার উপদেশ গুরুদেব আমাকে বার বার দিয়াছেন। কেবল তাহাই নয়, আমার দুই একখানি বই-এর প্রুফ পর্যন্ত তিনি নিজে দেখিয়া সংশোধন করিয়াছেন। কেবল আমি যে এই অনুগ্রহ পাইয়াছি তাহা নহে। অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা একটু-আধটু লিখিতে পারিতেন, তাঁহাদিগের উপর নানা বিষয়ের লেখার ভার দিয়া তিনি তাহা আদায় করিয়া লইতেছেন এবং সংশোধন করিয়া দিতেছেন, ইহাও দেখিয়াছি। ইহার ফলে এক সময়ে আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রদের ভিতরে সাহিত্য চর্চা খুব বাড়িয়াছিল।"

বিজ্ঞানচর্চায় জগদানন্দ, ভারততত্ত্ব, পালি ও বৌদ্ধ দর্শনের গবেষণায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চায় ক্ষিতি-মোহন সেন, বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

সাহিত্যরসিক অজিতকুমার চক্রবর্তী, গল্পচ্ছলে ইতিহাস ভূগোলের পাঠ্যগ্রন্থ রচনার পথিকৃৎ নেপালচন্দ্র রায়, পল্লী সংগঠন পরিকল্পনায় কালীমোহন ঘোষ, শিল্পসাধনায় নন্দলাল—সকলেই তাঁর নির্দেশে ও প্রেরণায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সম্মান অর্জন করেছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাঁদের যোগ চাকরী রক্ষার যোগ ছিল না। ছাত্রদের পড়িয়ে, সঙ্গ দিয়ে, শিক্ষকদের যোগ্য করে গড়ে নিয়ে, একটি আত্মিক যোগাযোগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি প্রাণবান পদ্ধতিতে রূপ দিতে পেরেছিলেন।

পাঠ্যপুস্তক রচনা ও নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন

রবীন্দ্রনাথ নিজের মনমত যেমন সব আদর্শ শিক্ষক গড়ে তুলেছিলেন তেমনি আবার ছেলেদের পড়াবার জন্যে নিজের পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত ইংরেজি ও বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সহকর্মী অধ্যাপকদেরও বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক লেখায় উৎসাহ দিতেন। অনেক সময় তাঁদের বইয়ের নামকরণও করেছেন, যেমন ১৯২২ সালে ভূগোলের পাঠ্য পুস্তকের নাম তিনিই রেখেছিলেন 'ভূ-পরিচয়।'

১৮৯৬ সালে তিনি হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় সর্বপ্রথম 'সংস্কৃত শিক্ষা' নামে দুই খণ্ডে একটি সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক লেখেন। পরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের পর হরিবাবুকে নিয়ে 'সংস্কৃত প্রবেশ' ১ম ও ২য় ভাগে সংস্কৃত পাঠ্য-

পুস্তক লেখেন। মৃত্যুশোক থেকে রেহাই পাবার জন্যে ১৯০৪ খৃস্টাব্দে বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্যে ইংরেজি ও বাংলায় পাঠ্য-পুস্তক রচনায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কোনো একটা মৃত্যুর শোক পেলে তিনি নিজেকে এই কার্যে মগ্ন রাখতেন। এই ধরনের ঘটনা পরেও আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় ঘটতে দেখেছি।

প্রত্যক্ষপন্থার পদ্ধতিতে (ডিরেক্ট মেথড) ইংরেজি পড়াবার জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখলেন—'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা' এবং তিন খণ্ডে 'ইংরেজি সোপান'। এগুলি ছাড়াও শিশুদের জন্য একখানি ইংরেজি রীডার লিখেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন তার 'ইংরেজি পাঠ'। শিশুবয়সে এই বইগুলির সব কটি আমি শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যখন ছাত্র ছিলাম, তখন পড়েছিলাম। সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে। এই বইগুলির পঠন-পদ্ধতি যেটা গুরুদেব প্রবর্তন করেছিলেন সেটাতে আমরা খেলা করার মত উৎসাহ পেতাম। এই পদ্ধতি আমাদের কাছে তখন খুব অভিনব বলে মনে হত। এই ডিরেক্ট মেথডে ইংরেজি শিক্ষা বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পথিকৃৎ। বর্তমানে এ বইগুলি প্রচলিত আছে কিনা জানি না। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় কোচবিহার থেকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তাতেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের এই চেষ্টাকে তিনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন।

কিছুদিন হইল পুস্তকখানি (ইংরেজি সোপান) পাইয়াছি

> ও অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে দেখিয়াছি। আমি যতদূর জানি এইরূপ পুস্তক বাংলায় এই প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার প্রণালী অত্যন্ত সুসঙ্গত—Otto, Ollendrof ও Saner প্রভৃতি ভাষাশিক্ষা পুস্তক-প্রণেতাগণ এই প্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য হইয়াছেন। আপনার উদ্ভাবনী শক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঋণী। এই ইংরেজি শিক্ষা বিষয়েও আপনি পথ প্রদর্শকের কাজ করিয়াছেন।

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সোপানের ভূমিকায় তাঁর উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন। ইংরেজি পড়ানোর তৎকালীন পদ্ধতি তাঁর পছন্দ ছিল না কিন্তু ছাত্রদের ইংরেজি শেখানোর আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। ভূমিকায় তাই বললেন :

> ইংরেজি সোপান বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য রচিত হইয়াছিল। এপর্যন্ত সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। কয়েক বৎসর বোলপুর বিদ্যালয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া যেরূপ ফললাভ করা গিয়াছে তাহাতে অসঙ্কোচে এই গ্রন্থ সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি।……
>
> ইহার সাহায্যে অল্পদিনেই শিক্ষার্থীগণ ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবেন। ইহা ভাষা শিক্ষার ড্রিল। শিক্ষক ক্লাসের সময় ছাত্রদিগকে দাঁড় করাইয়া

ইংরেজি ভাষায় আদেশ করিতে থাকিবেন। যখন বলিবামাত্র তাহারা যথারূপে আদেশ সম্পন্ন করিবে তখন বুঝা যাইবে আদেশ-বাক্যের তাৎপর্য তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ইংরেজি বই পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্বেই এই সহজ উপায়ে বিস্তর ইংরেজি শব্দ তাহাদের কর্ণে ও অর্থ তাহাদের মনে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। ইহাতে শিক্ষাকার্য অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইবে।

ইংরেজি সোপানের নিয়মিত পাঠ্য অংশ যখন ছাত্রগণ চর্চা করিবে তখন এই ড্রিল অংশ প্রত্যহ অভ্যাস করিতে থাকিলে তাহাদের উপকার হইবে।

অনেক ভেবেচিন্তে রবীন্দ্রনাথ এই নূতন পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখাবার পথ আবিষ্কার করেছিলেন। ইংরেজি ভাষা যে বিশ্বজগতের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের ভাষা সে কথা জানতেন বলেই ইংরেজি ভাষা যাতে ছেলেরা সহজে শেখে তারই জন্য তাঁর এই সব চেষ্টা ও পরিকল্পনা। আমার ছেলেবেলায় এই পদ্ধতিতে ইংরেজি ভাষা শিখেছি। মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ এই সময় ছোট ছেলেদের জন্যে 'ছুটির পড়া' নামে একটি বাংলা পাঠ্যপুস্তকও লিখেছিলেন।

কলকাতার মেট্রোপলিটান কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের স্বনামধন্য অধ্যাপক এবং গান্ধীপন্থী নেতা জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী ১৯০৯ খৃস্টাব্দে ব্রহ্মচর্যাশ্রম দেখতে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কথা

তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন একটি প্রবন্ধে (সুপ্রভাত, শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা ১৩১৬)।

এখন স্কুলে প্রায় একশত কি তাহারও কিছু বেশি ছেলে আছে। শিক্ষকের সংখ্যা পনের জন। পাঁচ-ছয় জন ছেলে লইয়া এক একটি শ্রেণী; বেশির ভাগ শেখা মুখে মুখে। শিক্ষার প্রণালী অতি সুন্দর—বিশেষত ভাষা শিক্ষার—যেটির ভার রবিবাবুর সম্পূর্ণ নিজের হাতে। সংস্কৃত ও ইংরাজি প্রথম শিক্ষার জন্য রবিবাবু যে প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালী আর কিছু আছে বলিয়া জানি না। আমরাও শিক্ষাব্যবসায়ী; প্রথম শিক্ষার্থীগণকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে কত কঠিন, ভুল শিক্ষা দেওয়া যে কত সহজ ও সেই ভুল শিক্ষার ফল যে কতদিন থাকে, তাহা আমরা কিছু কিছু জানি। ফার্স্ট বুক হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজি প্রথম শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের দেশে যত পুস্তক আছে সবই এক ধাঁচে লেখা—প্রথমে এক syllable এর কথা, তাহার পরে দুই syllable এর কথা, এইরূপে পরে পরে সিঁড়ি ভাঙার মতো, যেন ছেলেদের যত গোল বড় syllable এর কথা লইয়া। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষা লইয়া একটু আঁটাআঁটি করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে এটা সম্পূর্ণ ভুল। বড় কথায় ছেলেদের মোটে আটকায় না; তাহাদের যত গোল হয় sentence লইয়া। একটি সম্পূর্ণ ভাব (complete

idea) লইয়া sentence বা বাক্য। কিন্তু এই sentence বা বাক্যের গঠন লইয়াই ছেলেদের প্রথম বিপত্তি। যে ভাব বাংলায় প্রকাশ করিতে sentence-এর একরূপ গঠন, ইংরাজিতে সেই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য sentence-এর গঠন ঠিক অন্যরূপ। কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া সকলেরই বাংলায় ও ইংরাজিতে সম্পূর্ণ স্থানভেদ। এই কারণে ইংরাজি শিখাইতে হইলে একেবারে sentence হইতে আরম্ভ করাই উচিত ও সহজ। রবিবাবু এই মূল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই ভাবে তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী গঠিত করিয়াছেন··· রবিবাবু হাসিয়া বলিতেছিলেন "আমার স্কুলে ভাল ছেলে পাই না, এ যেন পেনাল সেটেলমেণ্টের মতো হইয়াছে। যে ছেলেকে বাপ মায় কিছু করিতে পারে না, তাহাকে যেন 'যা তুই বোলপুরের মাঠে যা' বলিয়া নির্বাসনে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।"···'খারাপ' ছেলে লইয়া বোলপুরে রবিবাবু যেরূপ ফললাভ করিয়াছেন, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।

এতক্ষণ আমি যা বলেছি সমস্তই আমার পূর্বসূরীদের কাছ থেকে শোনা বা তাঁদের লেখা পড়ে জানা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্রতী রূপটি ফুটিয়ে তোলাই আমার অভিপ্রায় ছিল। এইবারে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বরূপের পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। আমি নিজে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে যা জেনেছি সেই কথাই আপনাদের শোনাব।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভের অভিজ্ঞতা

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের দ্বিতীয় দশকে আমি সেখানকার ছাত্র ছিলাম। আমার এখনও মনে আছে ২৭শে জুন ১৯১০ গভীর রাত্রে শান্তিনিকেতনে প্রথম এসেছিলাম আমার পিতৃদেব স্বর্গত নেপালচন্দ্র রায়ের হাত ধরে, তখন আমার বয়স আট বছর। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ম্যাট্রিক ও প্রিপারেটরি বর্গের ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপনার কাজে বাবা তখন কিছুদিনের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু আমি এসেছিলাম স্থায়ী ছাত্র হয়ে। রবীন্দ্রনাথ তখন আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। এখানে এসে দেখলাম এখানে অন্যান্য স্কুলের মত না আছে কোনো ক্লাসঘর, না আছে ক্লাসের জন্য কোনো আসবাবপত্র।

ছাত্রেরা প্রাচীন কালের তপোবনের মত গাছের তলায় অধ্যাপককে ঘিরে বসে অধ্যয়ন করত। শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে সম্বন্ধটি যেমন ছিল মধুর, তেমনি ছিল আনন্দের। সে সম্বন্ধের মধ্যে না ছিল ভয়, না ছিল তাড়না। সকলে মিলে যেন একটি পরিবার গঠন করে বাস করত আর সেই পরিবারের মাথার উপর ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁরই পরিচালনায় আশ্রম-বিদ্যালয়টি ছিল যেন একটি আনন্দনিকেতন।

প্রায় এক দশক ধরে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আমার ছাত্রাবস্থা কেটেছে। এখানে যখন প্রথম এসেছিলাম তখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরিচয় অবিভক্ত বাংলাদেশের মধ্যেই সীমিত

ছিল। আর যখন প্রবেশিকা পাশ করে কলেজে পড়বার জন্যে কলকাতায় চলে এলাম, তখন গুরুদেব নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন, ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আড়াই শতের উপর এসে দাঁড়িয়েছে, সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে উপযুক্ত অধ্যাপকের সংখ্যাও। এই আশ্রমবিদ্যালয়ে তখন এসে গেছেন ক্যাপ্টেন পেটাভেল, পিয়র্সন সাহেব এবং এণ্ড্রুজ প্রভৃতি বিদেশী অধ্যাপকবৃন্দ। তবে আশ্রম বিদ্যালয় যখন নিতান্ত ছোট তখনই এখানে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে একটি উচ্চ পর্যায়ের লাইব্রেরী গড়ে উঠেছিল—নানা ধরনের দুষ্প্রাপ্য বই ছিল সেখানে। একটি ল্যাবরেটরীও ছিল—তার অতিকায় টেলি-স্কোপটি শৈশবে আমাদের বিস্ময়ের বস্তু ছিল।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদি যুগে ছাত্রদের শিক্ষাদানের স্বতন্ত্র রীতি ছিল। এখানে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার এক নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। নীচের দিকে কোনো শ্রেণীবিভাগ ছিল না, কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পড়ে শেষ করতে হবে এমন বাঁধাধরা কোনো নিয়মও ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকও ছিল না। যে বিষয়ে যে ছাত্র পারদর্শিতার সঙ্গে অগ্রসর হত সব সময় তাকে সেই বিষয়ে আরও অগ্রসর হতে সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া হত। গণিতে পারদর্শিতা কম বলে কাউকে সাহিত্যের উন্নতির পথে বাধা দেওয়া হত না। ফলে একই বছরে কোনো ছেলে হয়তো বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন বর্গ বা বিভাগে পড়ত। আমার নিজের কথা বলি—আমি

এসে ইংরেজি, বাংলা, ভূগোল, বিজ্ঞান ও প্রকৃতি-পরিচয়ে যে শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম গণিতে ভর্তি হয়েছিলাম তার এক শ্রেণী উপরে, ইতিহাস আরও উপরে। এ বিষয়ে আমার একটা মজার গল্প মনে পড়ছে। মাস কয়েক পরে পূজার ছুটিতে যখন বাড়ি গেছি আমার কাকারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোন ক্লাসে ভর্তি হয়েছ? আমি তার উত্তরে বলেছিলাম, "ইংরাজি, বাংলা, ভূগোলে 'সর্বেশ বর্গে', অঙ্কে 'অমিয় বর্গে', ইতিহাসে 'জ্যোতিষ বর্গে'।" শুনে আমার কাকারা হাঁ হয়ে গেলেন। বললেন, "ওসব বর্গ-টর্গ বুঝি না, কোন ক্লাসে ভর্তি হয়েছিস—ক্লাস টু না থ্রি, সেইটে বল।" আমি বলেছিলাম, "ওসব ক্লাস টু থ্রি বুঝি না—আমরা বুঝি 'সর্বেশ বর্গ' আর 'অমিয় বর্গ'।" তার উত্তরে আমার ছোটকাকা মন্তব্য করলেন, "ওখানে কি আর লেখাপড়া হয়? রবি ঠাকুর একে ধনী তার উপরে কবি, ওখানে তাঁর কবির খেয়ালে এক আড্ডাখানা খুলেছেন। বাপে-তাড়ানো, মায়ে-খেদানো বাঁদর ছেলেদের একটি পেনাল সেটেল্‌মেণ্টের ব্যবস্থা হয়েছে।"

সত্যই শান্তিনিকেতনে তখন অনেকগুলি বর্গ ছিল। চতুর্থ বর্গ থেকে নীচের দিকের সমস্ত বর্গগুলির পরিচয় সংখ্যায় চিহ্নিত না করে বর্গের এক একটি ছেলের নামে চিহ্নিত হত, যেমন সর্বেশ বর্গ, নীরদ বর্গ, অমিয় বর্গ, জ্যোতিষ বর্গ, সুশীল বর্গ, লব বর্গ ইত্যাদি। প্রয়োজনে বছরে দুবার অর্থাৎ ছ মাস অন্তর প্রমোশনের ব্যবস্থা ছিল। চতুর্থ বর্গের উপরে ছিল

তৃতীয় বর্গ (ক্লাস এইট)—এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতিতে ছেলেদের পড়ানো হত। এর পরের দুই বছরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্য বিষয় পড়িয়ে তাদের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরি করে দেওয়া হত। এই দুটি ক্লাসের নাম ছিল যথাক্রমে প্রিপারেটরি ও ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস।

কোনো বর্গে ছয়-সাতটির বেশি ছাত্র থাকত না। গুরুদেব মনে করতেন এক ক্লাসে বেশি ছেলে হলে তাদের প্রত্যেকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যায় না। সুতরাং কোনো ক্লাসে এর চেয়ে বেশি ছেলে হলেই তক্ষুনি আবার সেকসান ভাগ করা হত। এই জন্যে বর্গের সংখ্যা ছিল অনেক। ছাত্রাবাস বা আবাসিক কুটিরগুলির তিনটি বিভাগ ছিল—আদ্য মধ্য ও শিশু বিভাগ। বাইরে থেকে এসে আশ্রমবিদ্যালয়ে কোনো ছাত্র পড়তে পারত না, সব ছেলেই আবাসিক ছিল। প্রত্যেক আবাসিক কুটিরে একজন করে গৃহাধ্যক্ষ এবং একজন তাঁর সহকারী থাকতেন। এইভাবে প্রত্যেক ঘরে দু জন করে মাস্টার মশাই ছেলেদের সঙ্গেই থাকতেন। তারাই ছেলেদের লেখাপড়া, স্বাস্থ্য, আরোগ্য নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সবই দেখতেন এবং ছেলেদের সঙ্গে একত্রে বাস করে সব সময় তাদের সঙ্গ দিতে চেষ্টা করতেন। প্রশাসনিক ব্যাপারে ছেলেদের ছিল সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন। এমনকি তাদের বিচারসভাও ছিল। এই প্রসঙ্গে ১৯১২ সালের মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথ নেপালচন্দ্র রায়কে একটি চিঠিতে

লিখছেন—"সেদিন যে প্রস্তাব করিয়া আসিয়াছি আপনারা সেটা ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। আশ্রমের ভিতরকার সত্যটিকে ছেলেদের মনে স্পষ্টরূপে জাগাইবার জন্য ইতিপূর্বে অল্পস্বল্প যে কিছু চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার উৎসাহ অধিকদিন টেঁকে নাই—কেননা সেটা আমরা বাহির হইতে করিয়াছি এবং আমাদের নিজের দিকে Idea যেমন সুলভ, নিষ্ঠা তেমন নহে। এবারে বালকদিগকেই আহ্বান করিয়া দেখুন তাহারাই তাহাদের ইচ্ছার দ্বারা, দাবির দ্বারা, আমাদের চিত্তকে হয়ত সচেতন রাখিতে পারিবে। সমস্ত আশ্রমের একটি প্রাণের কেন্দ্র যদি গড়িয়া ওঠে তবে সেইখানে অতি সহজে আশ্রমের সুধারসটুকু সঞ্চিত হইতে থাকিবে।"

এই সময়ই ছেলেরা আশ্রম-সম্মিলনী সংগঠন করে নিজেদের পরিচালনা নিজেরাই করত। খেলাধূলা সহ সব বিষয়েই এক-জন করে ছাত্র-সম্পাদক নির্বাচন করে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্মের দায়িত্ব তাদেরই উপর দেওয়া হত। প্রতিদিন দু জন ছাত্র রান্নাঘরের ম্যানেজার হত। তারা রান্নাঘরের সব কাজ দেখাশোনা করত, অতিথি এলে তাঁদের পরিচর্যা করত এবং তাঁদের আশ্রম ঘুরিয়ে দেখাত। এই কাজের ভার যেদিন যাদের যাদের উপর থাকত সেদিন তাদের ক্লাসে যেতে হত না। কোনো ছেলে নিয়ম বিরুদ্ধ কিছু কাজ করলে তাকে বিচার-সভায় হাজির করা হত। ছাত্র-বিচারকরা যে কঠোর শাস্তি দিতেন মাস্টার মশাইরাও তেমন দিতেন না। জেনারেল

কাপ্তেনের ছিল তখন অপ্রতিহত ক্ষমতা। আশ্রম-সম্মিলনীর সম্পাদকের ক্ষমতাও কম ছিল না। তবে তাঁর executive কোনো ক্ষমতা ছিল না। আমাদের ছাত্রদের প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল অনেকটা diarchyর মতো। এদের দুজনের কাজ ও ক্ষমতা সংবিধান সম্মত ছিল। আশ্রম-সম্মিলনীর সভাগুলি হত পার্লামেণ্টের বিতর্ক সভার মত, আশ্রম-সম্মিলনীর উপবিধিগুলি প্রণয়নের কাজে রবীন্দ্রনাথের সহায়ক ছিলেন নেপালচন্দ্র রায়। তিনি ছিলেন আইন পাশ করা মানুষ। আইন সংবিধান প্রভৃতি রচনায় তাঁর নৈপুণ্য ছিল। কোনো এক সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'Constitution বিশারদ' বলে উল্লেখ করেছিলেন। শুধু ক্লাসে পড়ানোটুকুই নয়, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জীবনধারার সব কিছুর সঙ্গেই আমাদের সামগ্রিক শিক্ষার যোগ ছিল। মন্দিরে উপাসনা, আশ্রমের উৎসব, বিদ্যালয়ের ক্লাস, রাত্রে বৈতালিক দলের গান গেয়ে আশ্রম পরিক্রমা, সন্ধ্যার বিনোদন পর্ব, খেলাধূলা গান অভিনয় সাহিত্যসভা—এই সব কিছুই আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। সর্বোপরি ছিলেন গুরুদেব—তাঁর সান্নিধ্যে আশ্রমের সব খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর আমরা অনুভব করতে পারতাম। এমনকি তিনি যখন আশ্রমে থাকতেন না তখনও আমরা তাঁর স্পর্শ যেন অনুভব করতাম। তিনি যেন এই উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলা মাঠ ঘিরে একটি চন্দ্রাতপের মত গোটা আশ্রমকে আচ্ছাদন করে একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে রেখেছিলেন।

আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপনের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যেমন নিয়মিতভাবে ইংরেজি, সংস্কৃত, বাংলা ও গানের ক্লাস নিতেন, আমি এসে ঠিক সেই অবস্থা দেখিনি। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত মাঝে মাঝে আমি তাঁর কাছে ইংরেজি ও বাংলা পাঠ নিয়েছি। সংস্কৃত আমরা তাঁর কাছে কখনও পড়িনি। তবে বিদ্যালয় স্থাপন করে তিনি যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন দশ বছর পরে এসে আমিও সেই পদ্ধতিতেই পাঠ গ্রহণ করেছিলাম। তাঁর রচিত ও নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকগুলি তখনও একই ভাবে প্রচলিত ছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম ছয় মাস আমার পড়া-পড়া খেলার মধ্যে কেটেছিল। ইংরেজি পড়া আরম্ভ হয়েছিল নারায়ণ কাশীনাথ দেবলের কাছে। তিনি ছিলেন বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম অবাঙালি ছাত্র। ১৯১০ সালে আশ্রম বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে তিনি গুরুদেবের ইচ্ছায় আশ্রমেই অধ্যাপনার কাজে লেগে যান। এই সময় শান্তিনিকেতনে পরীক্ষামূলক পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টারীও তাঁকে করতে হত। তিনি কিছুদিন আমাদের গুরুদেবের লেখা 'ইংরেজি সোপান ১ম ভাগ' ধরে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ড্রিল করাতেন। আমাদের কাছে এটা খেলারই সামিল ছিল; মুখে মুখে ছোট ছোট বাক্যে ইংরেজি কথাবার্তা বলার খেলা খেলতে খেলতে আমরা এই বিদেশী ভাষায় ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠতাম। একদিনের একটি মজার ঘটনা বলি। রোজকার মতো গাছের তলায় দেবলদার ক্লাস

বসেছে—দেবলদা খানিকটা দূরে ক্লাসের সমস্ত ছেলেকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর সবিকে বললেন, 'সবি Come to me'. সবি দেবলদার কাছে এসে বলল, 'I come to you Dewalda'. তারপর ক্ষিতীশকে বললেন—'Kalu, you climb on the tree'. কালু তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে গাছের আগডালে উঠে চীৎকার করে বলল, 'Dewalda, I climb on the tree'. 'Sabi, you follow Kalu'. সবি তৎক্ষণাৎ গাছে উঠে বলল, 'I follow Kalu'. এমনি করে একে একে সবাই গাছের উপর উঠে গেল। আবার তলা থেকে হুকুম এল, 'Boys, you all come down'. ছেলেরা এবার সমস্বরে বলে উঠল 'No, Sir'. দেবলদা বললেন, 'What will you do now ?' ছেলেরা চীৎকার করে বলে উঠল—'We will play now ?' যেমন কথা তেমনই কাজ, সবাই মিলে 'বাঘা বাঘা' খেলতে আরম্ভ করল। একজন বাঘা হয়ে রইল গাছের নীচে মাটিতে, বাকি সবাই গাছের উপর। গাছের তলার বাঘা উপর দিকে চেয়ে হাঁক দিল, 'বাঘারে বাঘা!' উপর থেকে সমস্বরে উত্তর এল, 'কেন রে বাঘা ?' নীচের বাঘা জিজ্ঞাসা করল, 'তোদের কয়টি ছেলে' ? উত্তর এল, 'দশটি ছেলে।' বাঘা বললে, 'একটি আমায় দিবি ?' উত্তর হল, 'ছুঁতে পারলে নিবি।' এর পরেই বাঘা গাছের উপর চড়ে ছোঁবার চেষ্টা করতে লাগল। ছেলেরাও মাটিতে ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে পড়তে লাগল। মাটি স্পর্শ করলে

আর ছোঁয়া চলবে না। এদের মধ্যে হয়তো একজন খুব উঁচু ডালে আছে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়া যাবে না সে একটা ডাল বেয়ে নামবার চেষ্টা করছে—সেই সময় বাঘা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছুঁয়ে দিল। এখন সে হল বাঘা আর সকলে গাছে চড়ল। এমনি ভাবে খেলা চলতে লাগল। সকলে এক ডাল থেকে লাফিয়ে আর এক ডালে যাচ্ছে, বাঘাও তাদের অনুসরণ করে এ ডাল থেকে ও ডালে যেতে যেতে একজনকে শেষে ধরে ফেলছে। দেবলদা কিছুক্ষণ খেলায় উৎসাহ দিতেন। শেষে বোলপুর থেকে হরকরা এলে পোস্ট অফিসে চলে যেতেন। ক্লাস শেষের ঘণ্টাও পড়ে যেত। খেলা ছেড়ে ছেলেরা চলে যেত অন্য ক্লাসে।

"গাছের তলায় শিক্ষককে ঘিরে ছেলেরা কম্বলাসনে বসে পড়া আরম্ভ করল, কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত ছেলেরা সব গাছের আগডালে উঠে বসে আছে।"—কথাটি আমি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছিলাম শান্তিনিকেতনে আসবার এক বছর আগেই, সেই আমার রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখা। সেদিন এলাহাবাদের অ্যাংলো-বেঙলি স্কুলে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি প্রবাসী বাঙালি ছাত্রদের বাংলা শিক্ষাকে সরস করে তোলবার চেষ্টাকে উৎসাহিত করে-ছিলেন, যাতে তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবন জীবন্ত এবং আনন্দময় হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে বোলপুরের উন্মুক্ত মাঠের বিদ্যালয়টির আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও বলেছিলেন। তিনি যা

বলেছিলেন তা থেকে শান্তিনিকেতন সম্পর্কে অনেক কথা আমার জানা হয়েছিল, সে সব কথা আজও আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। তাঁর কথা থেকে জেনেছিলাম, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ছেলেরা একেবারে মুক্ত, তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে মহানন্দে প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে উঠছে—গাছ যেমন বাড়ে, তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এইজন্যেই তিনি তাঁদের শহর থেকে দূরে মাঠের মধ্যে টেনে এনেছেন। গাছের তলায় বসে তারা অধ্যয়ন করে, গাছের ডালে উঠে তারা খেলা করে, নীল আকাশ অবারিত মাঠ তাদের সাথী। আলো বাতাস রোদ বৃষ্টির প্রসাদ তারা জীবনে লাভ করে।

১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেনসিংটন থেকে গুরুদেব একখানি চিঠিতে জগদানন্দবাবুকে যে কথা লিখেছিলেন তাতে আমি আমার বাল্যকালে গুরুদেবের মুখে শোনা কথারই যেন প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

"আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটা বড় জিনিস লাভ করছে যেটা ক্লাসের জিনিস নয়—সেটা হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে আনন্দ—প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ। সেটাতে যদিও পরীক্ষার সহায়তা করে না কিন্তু জীবনকে সার্থক করে। আমাদের ছেলেরা বৃষ্টিতে ছুটে বেড়ায়, জ্যোৎস্না রাত্রিতে আনন্দ ভোগ করে, তারা রৌদ্রকে ভয় করে না, তারা গাছে চড়ে বসে যেমন খেলা করে তেমনি পড়া করে, এগুলোকে সামান্য জিনিস মনে করিনে। চারিদিকের সঙ্গে জীবনের

ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দেওয়া, আনন্দের ছোট বড় যাতায়াতের পথ খুলে দেওয়া যে কত বড় লাভ তা বলে শেষ করা যায় না।"

এলাহাবাদের সভার কথায় ফিরে আসি। আমার মনে আছে সেদিন রবীন্দ্রনাথ সভায় 'বন্দী বীর' ও 'সোনার তরী' আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। ছাত্রদের অনুরোধে তাঁর নিজের সুরে 'বন্দেমাতরম্' গানটিও গেয়েছিলেন। তখনকার দিনে মাইকের প্রচলন ছিল না, কিন্তু কবির গলা যেমন ছিল শ্রুতিমধুর তেমনি ছিল জোরালো। বন্দেমাতরম্ গান গেয়ে সেদিন তিনি সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন।

দেবলদার পরে তেজেশবাবু আমাদের ইংরেজির ক্লাস নিতে লাগলেন। মাঝে নেপালচন্দ্র রায়ও সামান্য দিন কয়েকের জন্য সখ করে আমাদের ইংরেজি পড়িয়েছিলেন। সাধারণত তিনি তখন সব চেয়ে উঁচু ক্লাসে ইংরেজি ও ইতিহাস এবং তৃতীয় বর্গে ইংরেজি পড়াতেন। শিশুবিভাগের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর পরিহাস এবং খেলাধূলার সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং এই প্রবীণ শিক্ষকটিকে পেয়ে শিশুদের উৎসাহ আনন্দের অবধি রইল না। তিনি এই সময় ইংরেজিতে ট্রেনে চড়া, স্নান করা, আহার করা প্রভৃতি বর্ণনাসূচক বাক্যগুলির ব্যবহার আমাদের শিখিয়েছিলেন। বাক্যগুলি যেমন উচ্চারণ করতাম সঙ্গে সঙ্গে তেমনি হাত-পা, মুখ-চোখ সঞ্চালন করে দেখাতে হত। সেটা ছিল যথোচিত ভাবের অভিব্যক্তি, অনেকটা অভিনয়ের 'এ্যাকশানের' মতো। যেমন—**sit, stand, lie, run, stop, walk,**

crawl, jump, bath, eat প্রভৃতি শব্দসমন্বিত বাক্য যখন অভ্যাস করাতেন তখন আমরা হেঁটে শুয়ে দৌড়ে দেখাতাম। যখন শিক্ষক বলতেন, 'You sit down there'. তৎক্ষণাৎ সেইখানে আমাদের বসে পড়ে বলতে হত, 'I sit down here, Sir'। এই সময় নেপালচন্দ্র আমাদের মাঝে মাঝে খোয়াইতে বেড়াতে নিয়ে যেতেন এবং যেতে যেতে চলত গুরুদেবের ইংরেজি সোপানে নির্দেশিত ভাষা শিক্ষার ড্রিল। খোয়াইতে গুরুদেব প্রবর্তিত ভাষা শিক্ষার ড্রিলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেপালচন্দ্র একটি ইংরেজি খেলা প্রবর্তন করেছিলেন। খেলাটা ছিল অনেকটা আমাদের কুমির-কুমির খেলার মতো। ছেলেরা সব স্নানার্থী হয়ে খোয়াইয়ের পাড়ে ডাঙা জমিতে ছড়িয়ে দাঁড়াত। একজন ছেলে হত কুমির, সে খোয়াইয়ের মধ্যে নীচু জমিতে নেমে যেত। কুমিরের এলাকায় ছুটে যাওয়া আর নিজের জায়গায় ফিরে আসাই ছিল খেলা। এই ছোটাছুটির মধ্যে কুমির যাকে ছুঁয়ে দিত সেই আবার হত কুমির।

খেলাটির আরম্ভে স্নানার্থী ছেলেদের কুমিরকে সম্বোধন করে ইংরেজিতে বলতে হত, "Alligator, Alligator, let us bathe in your waters." উত্তরে কুমির বলত, "No, my children not to-day !" বাকি লাইনগুলি মনে নেই। সেও তো প্রায় সত্তর বছর হয়ে গেল। এর পরেই কুমিরের নিষেধ উপেক্ষা করে আরম্ভ হত স্নানার্থীদের নকল স্নান, জলে ঝাঁপাঝাঁপি। "Alligator, I jump into your waters

and bathe." নেপালচন্দ্র শেষ পর্যন্ত নিজেও ছেলেদের সঙ্গে খেলতে নেমে যেতেন।

আমার মনে পড়ছে ১৯১২ সালে কালীমোহনবাবু বিলেতে একটি স্কুল দেখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"এদের যারা বৃদ্ধ তারা প্রায় সকলেই আমাদের নেপালবাবুর মতো। শিশুবিভাগের ছেলেদের দলে ভিড়ে ডাংগুলি প্রভৃতি নানাবিধ খেলা খেলতে পারেন আবার ফুটবল গ্রাউণ্ডে বড় ছেলেদের সঙ্গে মন খুলে মিশতে পারেন।" (শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়ঃ সাধনা কর ; ১৫ পৃঃ)

নেপালচন্দ্র আমাদের সামান্য দিন কয়েক পড়িয়েছিলেন তেজেশবাবুর জায়গায়। খুব সম্ভবত তেজেশবাবু তখন ছুটিতে গিয়েছিলেন। তিনি আবার ফিরে এলে আমাদের সর্বেশ বর্গের ইংরেজি ক্লাস তিনিই নিয়মিত নিয়েছিলেন ১৯১০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ কখনও বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করেন নি, যথার্থ শিক্ষকদের তিনি খুঁজে বের করেছেন। যোগ্য ব্যক্তিকে তাঁর মনের মতো গুরুতে পরিণত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তাঁরা সকলেই আশ্রম বিদ্যালয়কে সেবা করার উপযুক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা কবির সাধনায় যোগ দিয়ে আপন আপন শক্তি ও গুণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার সহায়ক হয়েছিলেন।

১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে বিদ্যালয়ের প্রমোশন

অনুষ্ঠিত হল। নতুন বছরে নতুন পাঠ্যপুস্তক হাতে এল, কিন্তু নূতন ক্লাসের আনন্দ বোধ হয় আমাদের মনে বাজেনি। কেননা সেই সর্বেশ বর্গে এবারেও রয়ে গেলাম। অথবা একথা বলতে পারি যে সর্বেশ বর্গেরই প্রমোশন হল। পূর্বেই বলেছি গুরুদেব এই আশ্রম বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি বিষয়ে একাধিক পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন তাঁর নূতন শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে। ইংরেজি শিক্ষণ ব্যাপারে তাঁর রচিত 'শ্রুতিশিক্ষা,' 'ইংরেজি সোপান' (১ম, ২য়, ৩য় ভাগ) এবং 'ইংরেজি পাঠ'। ক্লাস V standard পর্যন্ত তাঁর ইংরেজি ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং সেই ক্লাসগুলিতেই তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হত। তারপর থেকে উঁচু ক্লাস পর্যন্ত নিয়মিত তাঁর নিজস্ব কোনো শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল না। তবে ছেলেরা যাতে বিদেশী ভাষাকে আয়ত্তে আনতে পারে, এবং তার রসটুকু যাতে উপলব্ধি করতে পারে, তার জন্য মাঝে মাঝে সে ব্যবস্থাও তিনি করতেন।

আমরা নূতন ক্লাসে উঠে ইংরেজিতে গুরুদেবের লেখা 'ইংরেজি সোপান ২য় ভাগে'র সঙ্গে নূতন পাঠ্যপুস্তক পেলাম Newton's Reader। এই ক্লাসে পড়াতেন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। তিনি ইংরেজি সোপান ২য় ভাগের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ড্রিল করাতেন। Newton's Reader থেকে reading, hand writing, প্রতি শব্দের বাংলা অর্থ এবং প্রতিটি লাইনের বাংলা অনুবাদ তৈরি করিয়ে দিয়ে

লেখাতেন। Newton's Reader-এর বিজ্ঞানের কথাগুলি বিজ্ঞানের ক্লাসে পরীক্ষা করে দেখাতেন। অনেক সময় খোয়াইতে বেড়াতে নিয়ে গিয়েও ইংরেজি বলা শেখাতেন। এইভাবে আমাদের বিদেশী ভাষা শেখায় কান এবং জিহ্বার কাজ একত্রে এবছরেও চলেছিল।

১৯১২ সালে ডিসেম্বরের শেষে আমরা আর এক ধাপ প্রমোশন পেলাম। এ বছরে ইংরেজি পড়িয়েছিলেন অজিত-কুমার চক্রবর্তী। ইংরেজি সোপান তৃতীয় ভাগ আমাদের পাঠ্য ছিল। এখন থেকে আমাদের ডিরেক্ট মেথডের ড্রিল বন্ধ হল, শুরু হল লেখা। কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, বিশেষ্য, একবচন, বহুবচন, person এবং gender ইত্যাদি ইংরেজি ব্যাকরণের প্রাথমিক জ্ঞাতব্যগুলি বারে বারে লিখিয়ে বলিয়ে তর্জমার মাধ্যমে আমাদের সড়গড় করিয়ে দিতেন অজিতবাবু।

এই বই থেকেই তিনি আমাদের বাংলা থেকে ইংরেজির তর্জমা করাতেন। মনে পড়ে বইখানির উপর তিনি খুব জোর দিয়েছিলেন। সপ্তাহে তিন দিন এক পিরিয়ড করে এই বইখানি আমাদের পাঠ্য থাকত। অজিতবাবু আমাদের Sequence of tense দিয়ে আরম্ভ করে Exclamatory sentence, Voice change, Direct-Indirect narration দিয়ে শেষ করেছিলেন।

আমাদের ইংরেজি শব্দ-সঞ্চয় বাড়াবার জন্য গুরুদেব তখন বিলেত থেকে The King and the Rebel নামে একটি

নাটক লিখে অজিতবাবুকে পাঠিয়েছিলেন ১৯১৩ সালে গরমের ছুটির আগে; ষষ্ঠ বর্গের ছেলেরা অর্থাৎ আমরা এটি অভিনয় করেছিলাম। আমার সহপাঠী সতীশচন্দ্র রায় (ছাত্রকবি) সেজেছিল The King, আমি সেজেছিলাম The Rebel, সেনাপতি নরেন রায় এবং Chief Justice শশধর সিংহ এবং খুব সম্ভবত Prime Minister সেজেছিলেন প্রমথ বিশী। নাটকখানির পাণ্ডুলিপিতে Prime Minister এর সংলাপের পাশে মার্জিনে দেখা যায় গুরুদেব লিখেছেন "বিশী"। নাটকখানির আরম্ভের ইংরেজি সংলাপ আমার এখনও মনে আছে। নীচের ক্লাসের ছাত্রদের একযোগে ইংরেজি শিক্ষা ও আনন্দ দানের উদ্দেশ্যেই গুরুদেব এই নাটকটি লিখেছিলেন। সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকেও তিনি তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষার বিষয়ে ভাবছিলেন এ কথা ভাবতে অবাক লাগে। বাচনিক অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিক অভিনয় যোগে উপস্থিত প্রসঙ্গের অর্থ বুঝে মনে রাখাই ছিল গুরুদেবের নিজস্ব ইংরেজি শিক্ষা প্রণালী। নানা দিক থেকে এই প্রণালীর প্রয়োগ ও পরীক্ষা তিনি করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। The King and the Rebel সেই পরীক্ষারই একটা উদাহরণ মাত্র।

১৯১৪ সালে যখন আমরা চতুর্থ বর্গে উঠলাম, তখন থেকে প্রথা অনুযায়ী আমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্দিষ্ট ইংরেজি পাঠক্রমের বই ধরানো হল। তাতে রবীন্দ্রনাথের হাত ছিল না। তবু আমাদের উঁচু ক্লাসেও মাঝে মাঝে তিনি পড়াতেন

তাঁর নিজের মতো করে তৈরি করে নেবেন বলে। একেবারে হাল ছাড়েন নি। সে কথা পরে বলব।

১৯১২ সালে (১০ই ভাদ্র ১৩১৯) বিলেতে থাকার সময় গুরুদেব জগদানন্দ রায়কে লিখেছিলেন—

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের এই য়ুরোপ ভ্রমণ আমার বিদ্যালয়ের পক্ষে ব্যর্থ হবে না। আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে অনেকটা পরিমাণ প্রস্তুত হয়ে যেতে পারব। এবং হয়ত আমাদের বিদ্যালয়ের প্রতি এখানকার লোকের হৃদয় আকর্ষণ করে যেতে পারব। আমাদের সঙ্গে যদি এদেশের কেউ কেউ মিলতে পারেন তাহলে হয়ত আমাদের অনেক দুর্বলতা ও দারিদ্র্য মোচন হতে পারে।"

আমার মনে আছে সেবারে গুরুদেব বিদেশ সফর শেষ করে অক্টোবর মাসে পূজোর ছুটির মুখে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। পূজোর ছুটির আগে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়ের জন্য দিনুবাবু প্রায় দু মাস ছেলেদের তালিম দিয়ে তৈরি করেছিলেন। সেই প্রথম শান্তিনিকেতনে 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয় হল। গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করবার জন্যই যেন এই পরিকল্পনা হয়েছিল। মনে পড়ে নাট্যঘরে দর্শকদের মধ্যে বসে গুরুদেব সোৎসাহে দস্যুদের সমবেত কণ্ঠের গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে গান ধরেছিলেন। অভিনয়ের ভূমিকা বণ্টন হয়েছিল নিম্নলিখিত ভাবে—বাল্মীকি—অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রথম দস্যু—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় দস্যু—দেবেন দত্ত (ছাত্র),

তৃতীয় দস্যু—সুশীল চক্রবর্তী (ছাত্র), বালিকা ও সরস্বতী—অরবিন্দ চৌধুরী (এগার বছরের একটি ছেলে, আমারই সহপাঠী), লক্ষ্মী—শ্যামকান্ত গোবিন্দ সর্দেসাই (আশ্রম বিদ্যালয়ের অন্যতম মারাঠী ছাত্র), অন্যান্য দস্যুদের মধ্যে ছিলেন—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, সুধীর মিত্র (ঝুনা), ব্রজরাজদা, সন্তোষ মিত্র, নরভূপ রাও (আশ্রম বিদ্যালয়ের নেপালী ছাত্র), আলু রায় প্রভৃতি। বনবালকদের মধ্যে ছিলেন—জিতেন চৌধুরী, শিবদাস রায়, শশধর সিংহ, চারু মুখোপাধ্যায় (বুলা), সুশীল সেন, নৃপেন সেন, লবুদা, কুণ্ডদা প্রভৃতি। মনে পড়ে দীর্ঘদিন ধরে 'বাল্মীকি প্রতিভার' রিহার্সেল দেখে দেখে গোটা বইখানির সমস্ত গানগুলি ভাবের অভিব্যক্তি সমেত আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয় হবার পরদিন থেকেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পূজোর ছুটি আরম্ভ হয়ে গেল। একমাস পরে নভেম্বরে বিদ্যালয় খুলল। আর তার পর পরই ১৩ই নভেম্বর গুরুদেবের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবর এসে পৌঁছল। এ খবর পাবার পরে সাতদিন ধরে আশ্রমবাসীদের উৎসব আনন্দ ও উত্তেজনার শেষ ছিল না। অথচ প্রাইজ যিনি পেলেন সেই মানুষটি একেবারেই নির্বিকার রইলেন। গল্প শুনেছি যে-টেলিগ্রামে প্রাইজ পাওয়ার সংবাদ এল সেই টেলিগ্রামখানি নিঃশব্দে পড়ে নিতান্ত সহজভাবে সেটি অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়কে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন মশাই, এবার আপনাদের ড্রেন তৈরী করবার টাকা হল।'

যাক সে কথা। আশ্রমের কথায় ফিরে আসি। আগেই বলেছি গুরুদেব আমাদের সময় আর আগের মতো সব সময় ছেলেদের সঙ্গে থাকতেন না বা তাদের পড়াতেন না। আর একটি প্রধান কারণ হল এই সময় তিনি এমন কয়েকজন সহৃদয় শিক্ষক পেয়েছিলেন যাঁরা আপন আপন শক্তি গুণ ও স্বভাবের বৈশিষ্ট্য অনুসারে রবীন্দ্রনাথের কল্পিত গুরুর আদর্শ মূর্ত করে তুলেছিলেন। গুরুদেবও এঁদের উপর সর্ববিষয়ে খুব নির্ভর করতেন কিন্তু তিনি যখন স্বয়ং আশ্রমে থাকতেন তখন সন্ধ্যার সময় বিনোদন পর্বে তাঁর কাছে নিয়মিত ভাবে চলত আমাদের সাহিত্যচর্চা বা পাঠচর্চা। আমার মনে পড়ে ১৯১৪ সালে আমি যখন চতুর্থ বর্গে পড়ি তখন গুরুদেব প্রবেশিকা বর্গ থেকে চতুর্থ বর্গের ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের নিয়ে ক্লাস করতেন। সেটা ঠিক ক্লাসের পড়া নয়। এই সময় তিনি আমাদের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস পড়াতে আরম্ভ করেছিলেন। চসার থেকে আরম্ভ করে শেক্সপীয়ার পর্যন্ত তিনি এগিয়েছিলেন।

তিনি বাংলায় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস অনর্গল বলে যেতেন। অনেক ছেলেদের তখন নোট নিতেও দেখেছিলাম। কিন্তু গুরুদেব কখনও এই প্রসঙ্গে ছেলেদের কোনো প্রশ্ন করতেন না। গুরুদেব বাইরে চলে গেলেন বলে এই ক্লাসের ছেদ পড়ে গেল।

১৯১৫ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর জুলাই-আগস্ট মাসে তিনি আমাদের এই দলটিকে তাঁর প্রিয় ইংরেজ কবি শেলি, ওয়ার্ডস-

ওয়ার্থ, ব্রাউনিং, কীট্স্ প্রভৃতির কবিতা পড়াতেও আরম্ভ করেছিলেন। প্রথমে কবিতাটি আগাগোড়া আবৃত্তি করে শোনাতেন তারপরে চলত বাংলায় তার ব্যাখ্যা। এই সময় যে-সমস্ত কবিতা তিনি পড়িয়েছিলেন তার মধ্যে শেলির কবিতাই বেশি করে মনে পড়ে। চার দিন ধরে Hymn to Intellectual Beauty পড়িয়েছিলেন। বেশ মনে পড়ে শেলির ক্লাস কিছুদিন ধরে নিয়মিত ভাবেই চলেছিল। Ode to the West Wind, Lift not the painted veil প্রভৃতি কবিতাগুলি তিনি এই সময় পড়িয়েছিলেন।

মাঝে মাঝে তিনি তাঁর নূতন লেখা পড়ে শোনাতেন। যতদূর মনে পড়ে 'ঘরে বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস দুখানি মাস্টারমশাইদের কাছে ধারাবাহিক ভাবে এই সময়েই তিনি পড়েছিলেন। আমরা তখনও বড় হইনি বলে গুরুদেবের সেই উপন্যাস পাঠের আসর থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম—দূর থেকে এই আসরে গুরুদেবের সঙ্গে মাস্টারমশাইদের আলাপ-আলোচনা কানে আসত। এই পাঠচক্র চলত নিয়মিত। দ্বারিকের বারান্দায় এই পাঠসভা বসত। ১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে ও বিনোদন পর্বে কখনও কখনও গুরুদেব দিনুবাবুর পাশে বসে ছেলেদের গান এবং অভিনয় শেখাতেন। এটা ছিল কলকাতায় 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের কাল। যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে কলকাতায় 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের কথা হয়েছিল বলে নিয়মিত রিহার্সেল হত। একটা কথা বলি—তখনকার দিনে নাটকের

রিহার্সেলে আশ্রমবাসী প্রায় সকলেই উপস্থিত থাকতেন। —এও যেন আশ্রমের শিক্ষারই একটা দিক ছিল। এই সময়ে ক্লাসেও গুরুদেব ম্যাথু আরনল্ডের সোরাব রুস্তম পড়াতে আরম্ভ করেছিলেন এবং গরমের ছুটি আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত এই ক্লাস চলেছিল—ছুটির মধ্যেই যে মাসে গুরুদেব এণ্ডরুজ পিয়র্সন এবং মুকুল দেকে নিয়ে জাপান হয়ে আমেরিকায় চলে যান। একমাস পরে এণ্ডরুজ জাপান থেকে একা আশ্রমে ফিরে এলেন। গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর দায়িত্ব যেন অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল। এই সময় আমরা প্রিপারেটরি ক্লাসে পড়তাম। এণ্ডরুজ ফিরে আমাদের ইংরেজি ক্লাস নিতে লাগলেন—বিশেষ করে ইংরেজি কবিতাগুলি পড়াতেন। প্রথমেই তিনি গুরুদেবের আরব্ধ সোরাব রুস্তম পড়িয়ে শেষ করেছিলেন। তারপরে গোল্ডস্মিথের Deserted Village এবং Grey's Elegy পড়িয়েছিলেন। পড়াবার সময় কি সুন্দর সুন্দর গল্প বলতেন, অবশ্যই ইংরেজিতে, কেননা এণ্ডরুজ সাহেব বাংলা জানতেন না। প্রত্যেকটি কলির উপর ছোট ছোট করে টীকা লিখিয়ে দিতেন। পরে কলকাতায় কলেজে পড়বার সময় এই নোটগুলি আমার খুব কাজে লেগেছিল।

১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আবার নিয়মিত ইংরেজি ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন। এই বছর মে মাসে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার মৃত্যু হল কঠিন রোগভোগের পরে। সন্তানশোকের সঙ্গে বাইরের নানা বেদনাদায়ক ঘটনার অভিঘাত

জড়িত হয়ে তাঁর মনোবেদনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে যে Tagore's name with German Plots শিরোনামায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তার মিথ্যা অপবাদও তাঁকে কম বিচলিত করেনি। প্রতিবাদে প্রেসিডেন্ট উইলসনকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। এই সময়ে তিনি একনাগাড়ে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুললে নানা আঘাত ও বেদনায় ক্ষতবিক্ষত মন নিয়ে নিজেকে তিনি গভীরভাবে শিক্ষকতার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। এই সময় তিনি প্রবেশিকা বর্গ থেকে আরম্ভ করে ষষ্ঠ বর্গ পর্যন্ত সব কটি ক্লাসে এক পিরিয়ড ছাত্রদের ইংরেজি পড়াতেন। আমরা তখন প্রবেশিকা বর্গের ছাত্র। গুরুদেবের কাছে সমানে পাঁচ-ছ মাস ধরে ইংরেজি পড়বার সৌভাগ্য তখন আমার হয়েছিল। আমার বেশ মনে পড়ে বিকেলে সেকেণ্ড পিরিয়ডে দেহলির দোতলায় গিয়ে আমরা তাঁর কাছে ইংরেজি পড়ে আসতাম। তাঁর ইংরেজি পড়াবার ধরনটা ছিল অভিনব ; মনে হত যেন অভিনয় দেখছি। আমাদের মনকে তিনি এমনই চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে রাখতেন ক্লাসে অমনযোগী হবার আমরা কোনো অবকাশই পেতাম না। গুরুদেবের ক্লাসগুলির জন্য আশ্রমের মধ্যে তখন বিশেষ করে একটি 'উটজ' নির্মিত হয়েছিল। এর আগে আমরা কখনো 'উটজ' দেখিনি বা কথাটি শুনিও নি। সেই প্রথম 'উটজ'টি এখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আশ্রমে ছেলেদের নিয়ে এই সময় তাঁর নিয়মিত অনুবাদ-চর্চা চলেছিল। অনুবাদচর্চা বইটিও এই সময়েই লিখতে সুরু করেন। গুরুদেবের ক্লাসে অনুবাদচর্চার জন্য তাঁর নির্দেশ অনুসারে আমাদের তিন প্রস্থ খাতা রাখতে হত। একটি ইংরেজি, একটি বাংলা এবং আর একটি খসড়া খাতা। প্রতিদিন একটি করে বাংলা অনুচ্ছেদ আমাদের ইংরেজি তর্জমার জন্য নির্ধারিত খাতায় লিখিয়ে দিতেন।

ক্লাস নিতে আরম্ভ করে গুরুদেব প্রথমেই রোডোফিসের গল্প থেকে একটি বাংলা অনুচ্ছেদ আমাদের খসড়া খাতায় লিখিয়ে দিলেন। নির্দেশ দিলেন বাংলার জন্য নির্ধারিত খাতাটিতে এই অনুচ্ছেদটি ফেয়ার করে এনে পরদিন তাঁকে দেখাতে হবে। খসড়া খাতায় বাংলা ডিকটেশনটির বানান-গুলিও শুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। গুরুদেব প্রায়ই বলতেন যে অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রণালীকেই তিনি প্রশস্ত বলে মনে করেন। কিভাবে যে তিনি আমাদের ভাষা শেখাতেন, কি রকম ছিল তাঁর পড়াবার ধরন সেকথা লিখে বোঝানো আমার সাধ্যাতীত। Demonstrate করে না দেখালে সেই অমূল্য জিনিস বোঝানো যাবে না এবং সেটাও আমার পক্ষে এতদিন পরে অভিনয় করে দেখানো সহজসাধ্য নয়। যা হোক একটু চেষ্টা করা যেতে পারে। রোডোফিসের উদাহরণটিই নেওয়া যাক। যতদূর মনে পড়ে অনুচ্ছেদটি গুরুদেব এইভাবে লিখিয়ে দিয়েছিলেন :

"অনেকদিন আগে রোডোফিস নামে একটি সুন্দরী মেয়ে তার সঙ্গীদের সঙ্গে নীলনদের জলে স্নান করছিল ; এমন সময় হঠাৎ একটি চিল আকাশ থেকে দ্রুত নেমে এসে তার ছোট চটি জুতার একপাটি ছোঁ মেরে নিয়ে মরুভূমির উপর দিয়ে উড়ে গেল।" পাঠের এই অনুচ্ছেদটি নিয়ে আমাদের মধ্যে এক-জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "'অনেক দিন আগে'র কি ইংরেজি লিখবি ?" আমরা একসঙ্গে সকলেই চিৎকার করে বললাম, Long ago। গুরুদেব বললেন, "বাঃ ঠিক হয়েছে।" তার পরের কথাটি হচ্ছে, 'রোডোফিস নামে একটি সুন্দরী মেয়ে'। গুরুদেব বললেন, "বাংলায় কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াপদ sentence-এ যেভাবে সাজানো থাকে ইংরেজিতে কিন্তু তা বদলে যায়। সব সময় ইংরেজি sentence-এর যেটা কর্তৃপদ তাকে বিশেষণ-সহ আগে বসাতে হয়। বাংলায় যেমন আমরা বলি রোডোফিস নামে একটি সুন্দরী মেয়ে, ইংরেজিতে সাধারণত বলা হয় একটি সুন্দরী মেয়ে রোডোফিস নামে।" গুরুদেব একজনকে নির্দেশ করে বললেন, "তুই বল্ 'একটি সুন্দরী মেয়ে'র ইংরেজি কি লিখবি ? দেখিস a অথবা the এই article গুলো যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করতে যেন ভুলবি না। এইবার সুন্দরী মেয়ের ইংরেজি বল্।" ছেলেটি বলল, A beautiful girl। গুরুদেব বললেন, "বাঃ ঠিক হয়েছে।" তারপরে আর এক-জনকে বললেন, "এবার তুই বল্ 'রোডোফিস নামে'-এর কি ইংরেজি লিখবি ?" ছেলেটি উত্তর দিল, Named Rhodo-

pis। আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই বল্ 'তার সঙ্গীদের সঙ্গে'। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ বলল, with her companions। গুরুদেব বললেন, "বাঃ companion কথাটা তোরা ঠিক জানিস দেখছি।" তারপরে আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "'নীল নদীতে স্নান করছিল'। ইংরেজিতে 'স্নান করছিল' verb টা আগে হবে এবং adverb পরে হবে। তাহলে এখানে verb কি?" ছেলেটি বলল, 'স্নান করছিল'।" "বেশ, adverb কি?" ছেলেটি বলল, 'নীল নদীতে।' তারপর আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই 'স্নান করছিল' ইংরেজিটা বল্ এবার।" ছেলেটি বলল, was bathing। তখন আবার সেই ছেলেটিকেই জিজ্ঞাসা করলেন, "একটু আগে তো বলা হল Rhodopis with her companions, তাহলে এখানে were bathing না বলে was bathing বললি কেন?" ছেলেটি বলল, "এখানে কর্তা হচ্ছে Rhodopis একা, third person singular number, তার companions হচ্ছে Adjective Clause, Rhodopis-কে qualify করছে। সুতরাং verb-এর third person singuler number-ই ব্যবহার করতে হবে। এই জন্য were bathing না বলে আমি was bathing বললাম।" গুরুদেব বললেন, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস। এবার adverbটা কি? কোথায় স্নান করছিল? 'নীল নদীতে।' আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নীল নদীতে' কি লিখবি?" ছেলেটি বলল,

In the (দি) river Nile। গুরুদেব ছেলেটিকে সংশোধন করে বললেন, "দি নয়, বল In the (দা) river Nile।" ছেলেটি গুরুদেবকে নকল করে বললে, In the (দা) river Nile। গুরুদেব তারপর বললেন, "river তো সবাই লেখে, river-এর বিকল্পে আর কোনো কথা বলতে পারিস ?" 'তুই', 'তুই' বলে প্রত্যেককে জনে জনে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন "river-এর বিকল্পে আর কি বলতে পারিস।" কেউ বলতে পারল না। সতীশের পালা যখন এল সে বললে, waters। গুরুদেব বেশ একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "তুই কি করে পারলি ?" বিস্মিত নয়নে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। সতীশ বলল, "৭৷৮ বছর আগে যখন ইংরেজি সোপানের ড্রিল করাচ্ছিলেন নেপালবাবু, তখন একটা ইংরেজি কুমির কুমির খেলা শিখিয়েছিলেন। ঐ খেলায় আমাদের বলতে হত, Alligator! Alligator! Let us bathe in your waters।" গুরুদেব প্রসন্ন চিত্তে স্মিত হেসে বললেন, "সে কথা এখনও তোর মনে আছে ? তোর স্মৃতিশক্তি তো খুব প্রখর। আমার কিন্তু কিছুই মনে থাকে না।" শব্দটির প্রয়োগ নিয়ে আমাদের খানিকক্ষণ বোঝালেন। বাংলায় 'জল' শব্দের বহুবচন প্রয়োগ নেই ; 'জলগুলি' তো কেউ বলে না। ইংরেজিতে এবং সংস্কৃতে কিন্তু 'জল' শব্দের বহুবচন প্রয়োগ হতে পারে। এখানেও তাই হয়েছে। water-এর জায়গায় waters of Nile ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্কৃতে 'জল' শব্দ যে বহুবচনে ব্যবহৃত হয়

উদাহরণ স্বরূপ একটি সংস্কৃত শ্লোক আমাদের আবৃত্তি করে শোনালেন। ষাট বছর হয়ে গেল—সে শ্লোকটি আমার মনে পড়ছে না। এর পরে গুরুদেব বললেন, "ছাখ্, river শব্দের বদলে in the waters of Nile বললে ভাল শোনায় না? কি রকম একটা rhythm আছে এর মধ্যে।" আমরা না বুঝেই খুব উৎসাহের সঙ্গে সায় দিয়ে বললাম, "হ্যাঁ।" এবার গুরুদেব সতীশ রায়কে বললেন "তুই এবার বল্ সমস্ত sentence-টা কি দাঁড়াল।" আমাদের নির্দেশ দিলেন, "তোদের রাফ্ খাতায় লিখে নে।" সতীশ তখন ইংরেজিতে বলতে লাগল, Long ago a beautiful girl named Rhodopis, with her companions, was bathing in the waters of Nile। এবার বাক্যের পরের অংশ। গুরুদেব নতুন একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "'এমন সময় হঠাৎ একটি চিল,'—আচ্ছা, 'এমন সময়ের' ইংরেজি কি হবে বল্।" ছেলেটি চুপ করে বসেছিল। গুরুদেব দুবার তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেটি তবু চুপ করেই থাকল, কোনো উত্তর দিল না। বিরক্ত হয়ে গুরুদেব তাকে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, "ছাখো, আমার ক্লাসে এসে চুপ করে বসে থাকা চলবে না। শুদ্ধ হোক ভুল হোক, যাই হোক না কেন একটা কিছু বলতেই হবে। ভুল হলে সেটা সংশোধন করার জন্যেই তো আমি তোমাদের এখানে-ডেকেছি। চুপ করেই যদি থাকবে তাহলে আমার ক্লাসে এসো না।" গুরুদেব সাধারণত ছেলেদের 'তুই

তুই' করে বলতেন। কিন্তু 'তুমি' আরম্ভ করলেই আমরা বুঝতাম গুরুদেব চটেছেন। পড়া না পারলে অথবা ভুল বললে কখনও বিরক্ত তো হতেনই না, সাধারণ শিক্ষকের মতো বিদ্রূপও করতেন না। সব সময় খুব উৎসাহ দিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভুল সংশোধন করে দিতেন। · কিন্তু তাঁর কথার উত্তর না দিলে ভয়ানক চটে যেতেন। গুরুদেবের কাছে তিরস্কৃত হয়ে অতঃপর ছেলেটি 'এমন সময়ের' ইংরেজি বলল, At that time। তারপর তাকেই আবার জিজ্ঞেস করলেন, "'হঠাৎ' কি বলবি ?" সে বলল suddenly। "তাহলে পুরো কথাটা কি দাঁড়াল ?" At that time suddenly। গুরুদেব তখন বললেন, "আমি হলে বলতাম কি জানিস, When suddenly। At that time—তিনটি শব্দের জায়গায় ছাখ্ দেখি এক কথায় কেমন সুন্দর হয়ে গেল। 'একটি চিলে'র ইংরেজি কি বলবি।" একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন। সবাই বলল, A kite। গুরুদেব বললেন, "ওদেশে চিলকে eagle বলে। তাছাড়া kite-এর বদলে eagle বললে শোনায় ভাল। Eagle এর আগে article কি দিবি ?" ছেলেটি বলল, An eagle। গুরুদেব তাকে খুব তারিফ করলেন। "তাহলে কথাটি অবশেষে কি দাঁড়াল, suddenly when an eagle।" এবার তার পরের অংশ, 'আকাশ থেকে দ্রুত নেমে এসে তার ছোট চটি জুতার একপাটি ছোঁ মেরে নিয়ে মরুভূমির উপর দিয়ে উড়ে গেল'। একজনকে

জিজ্ঞাসা করলেন, "'আকাশ থেকে দ্রুত নেমে এল'—ইংরেজি কি লিখবি ?" ছেলেটি উত্তর করল, Swiftly came down from the sky। তাকেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "'তার ছোট চটি জুতার একপাটি ছোঁ মেরে নিয়ে মরুভূমির উপর দিয়ে উড়ে গেল'—কি অনুবাদ করবি ?" ছেলেটি উত্তর করল, taking one of the pair of her small slippers flew away with it over the desert। গুরুদেব বললেন, "তোর হয়েছে, তবে ভাল ইংরেজি হয় নি।" এখানে তিনি আবার সকলকে বোঝালেন, "বাংলায় আমরা অসমাপিকা ক্রিয়া যতটা ব্যবহার করি ইংরেজিতে ততটা participle ব্যবহার করলে সেটা কদর্য ইংরেজি হয়। এখানে ইংরেজিতে participle বেশি ব্যবহার না করে complete verb বসিয়ে পুরো sentence করে সেটাকে principal sentence-এর noun অথবা adjective অথবা adverb clause করে দিলে ভাল হয়।" আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "'আকাশ থেকে দ্রুত নেমে এল' তুই এর চেয়ে সুন্দর করে বল্ দেখিনি। 'আকাশ থেকে দ্রুত নেমে আসা'—সমস্ত বাক্যটা একটা কথা দিয়ে বল।" কেউ বলল dived down, কেউ বলল came down, কিন্তু গুরুদেব যে কথাটি চাইছিলেন সেটা কেউ বলতে পারল না। অথচ প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেই খুব উৎসাহ দিয়ে বলছিলেন, "বল্, বল্, তোর হচ্ছে।" যখন সে পারছে না, তখন গুরুদেব হতাশ হয়ে বললেন, "য়্যাঃ,

সব গুলিয়ে দিলি!" বাস্, আর কোনো কঠোর মন্তব্য নয়। অবশেষে কেউ যখন পারল না, তখন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তারস্বরে নিজেই বলে উঠলেন, "swcoped down।" তারপর স্মিত হেসে বললেন, "ছ্যাখ্ দেখি তোরা তো কেউ পারলি না, আমি কেমন পেরে গেলুম!" সঙ্গে সঙ্গে বিশী বলে ফেলল, "আপনার হাতে তো বই আছে।" ক্লাসে একটা হাসির রোল উঠল। মনে পড়ে গুরুদেবও জোরে হেসে উঠেছিলেন। এরপর আবার প্রশ্ন আরম্ভ হল। "'ছোঁ মেরে নিয়ে গেল'—এখানে participle না দিয়ে বল্ দেখিনি কি বলবি। swooped down, snatched up—কি নিল? 'ছোট চটি জুতার একপাটি'। 'ছোট' কি লিখবি?" কেউ বলল small, কেউ বলল little। গুরুদেব তখন চেঁচিয়ে বললেন, "tiny কথাটা শুনিস নি তোরা?" সবাই বলল, "হ্যাঁ শুনেছি।" "তবে এখানে খাটাতে পারছিস না কেন? এবারে বল্, swooped down, snatched up, এখানে 'ছোট চটি জুতার' ইংরেজি কি লিখিবি?" সবাই বলল, 'tiny slipper'। উনি বললেন, "slipper না বলে এখানে sandel বল্।" তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "এইবারে সমস্ত sentenceটা কি দাঁড়াচ্ছে বল্।" Suddenly when an eagle swooped down, snatched up one of her tiny sandels. এবার 'মরুভূমির উপর দিয়ে উড়ে গেল'—আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই বল্—উড়ে

যাওয়ার ইংরেজি কি ?" সে বলল, fly। "Past Tense-এ কি লিখবি ?" সে বলল flew। "'উড়ে গেল' কি দিবি ?" সে বললে, flew away with it। উনি বললেন, "with it-টা না বললেও অনুবাদে কিছু আসে যায় না।" এক-জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "'মরুভূমির উপর দিয়ে' কি লিখবি ?" উত্তর এল, over the desert। তখন সতীশকে বললেন, "আগাগোড়া আজকে যা অনুবাদ হল সেটা তুই কি লিখেছিস্, পড়্ এবার।" সতীশ তার রাফ্ খাতা থেকে পড়তে লাগল :

Long ago a beautiful girl named Rhodopis, with her companions, was bathing in the waters of Nile, suddenly when an eagle swooped down, snatched up one of her tiny sandels and flew away with it over the desert. "বাংলায় কিন্তু এই with it কথাটার প্রতিশব্দ ব্যবহার হয় নি। ইংরেজিতে যদিও আছে তবুও তোরা সেটা ব্যবহার না করতেও পারিস।"

এমনি করে দিনের পর দিন চলতে লাগল আমাদের সঙ্গে গুরুদেবের অনুবাদচর্চা। একদিন মনে আছে কোনো একটা বাংলা অনুচ্ছেদ ইংরেজিতে তর্জমা করার সময় 'পুনর্যৌবন' কথাটার ইংরেজি প্রতিশব্দ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই বল পুনর্যৌবনের ইংরেজি।" ছেলেটি অত্যন্ত সংশয়ের সঙ্গে—ছাত্ররা যেমন থিতিয়ে থিতিয়ে

একটি একটি করে শব্দ উচ্চারণ করে বলে, ঠিক তেমনি ভাবে বলতে লাগল—প্রথমে Re কথাটা বলে থেমে গেল ; গুরুদেব তাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, "থামলি কেন, বলে যা, বল্, তোর হচ্ছে"—উৎসাহের চোটে ছেলেটি হঠাৎ বলে ফেলল rebirth। গুরুদেব হো হো করে হেসে উঠলেন। পরিহাস করে বললেন, "যাঃ, উৎসাহের চোটে একেবারে সব গুলিয়ে দিলি। আরে rebirth তো পুনর্জন্ম ; আমি চেয়েছি পুনর্যৌবন"। আমার বেশ মনে পড়ে এমন সময় আমাদের সহপাঠী বিজয় বাসু নামে একটি মালয়ালম ছেলে বলে উঠল rejuvination। গুরুদেব অভিনয়ের ভঙ্গিতে অবাক হয়ে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। যেন সে একটা অসাধ্যসাধন করে ফেলেছে। "তুই বলে ফেললি ? আরে আমিই তো পারতুম না। কে বলে যে তোরা ইংরেজিতে কাঁচা ?"

তর্জমা হয়ে গেলে সেগুলি ইংরেজি খাতায় ফেয়ার করে তাঁকে দেখাতে হত। তিনি সতীশের খাতাটা খুব ভাল করে দেখতেন ; তার হাতের লেখাটা খুব সুন্দর ছিল। আর সকলের খাতা চোখ বুলিয়ে যেতেন। সতীশের খাতায় লাল কালি দিয়ে punctuation এবং বানানগুলো ঠিক করে দিতেন। সকলকে বলতেন, "সতীশের খাতা দেখে যার যার ভুল সংশোধন করে নিস।" আমরা বাংলার ফেয়ার খাতায় অনুচ্ছেদগুলি লিখতাম, ইংরেজি অনুবাদ যা হত সেটা ইংরেজি

ফেরার খাতায় তুলে নিতাম। বাংলা এবং ইংরেজি এক সঙ্গেই রাফ্ খাতায় থাকত পাশাপাশি। সপ্তাহখানেক ধরে বাংলা থেকে ইংরেজিই হত, এমনি করে সপ্তাহ শেষ হলে বাংলার খাতাগুলি তিনি সব চেয়ে নিতেন এবং তখন ইংরেজি paragraph লিখিয়ে দিতেন এবং পরের সপ্তাহে চলত ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ। প্রথমে কিছুকাল চার পাঁচটির বেশি sentence এগোত না। ক্রমশ কাজ দ্রুত এগোতে থাকল। গুরুদেবের সঙ্গে এই অনুবাদচর্চার ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমরা ইংরেজি ও বাংলায় আশাতীত নম্বর পেয়েছিলাম।

ইংরেজি থেকে যখন বাংলায় অনুবাদচর্চা আরম্ভ হল সেটা খুব দ্রুত শেষ হয়েছিল। কেননা গুরুদেব যে বাংলাটা ইংরেজি করবার সময় আমাদের পূর্বে লিখিয়ে দিয়েছিলেন সেই কথাগুলি আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়েই ছিল। অনুবাদ-চর্চার সময় আমরা সে কথাগুলো চটপট বলে দিতাম। গুরুদেব তখন ছেলেদের স্মৃতিশক্তির খুব তারিফ করতেন।

গুরুদেবের ক্লাস নেওয়া সম্বন্ধে যা দেখে আমরা খুব বিস্মিত হতাম সেটা হচ্ছে তিনি প্রতিদিন উটজতে একাসনে বসে চার পাঁচ পিরিয়ড ধরে একটার পর একটা ক্লাস নিতেন। এই ক্লাস নেওয়ার রীতি একটানা পাঁচ মাস চলেছিল; তাতে তাঁর কিছুমাত্র ক্লান্তি ছিল না। বিশ্রামেরও ধার ধারতেন না। এই সময় গুরুদেবের পড়ানোটা এমন চিত্তাকর্ষক হত যে রামানন্দবাবু, নেপালবাবু এবং এণ্ড্রুজ প্রভৃতি

আরও অনেকে তাঁর এই অনুবাদচর্চার ক্লাসের মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন।

সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রতি যারপরনাই বিরূপ ছিলেন। অনেক প্রবন্ধে এই পদ্ধতির কঠোর সমালোচনাও করেছিলেন। তিনি বলতেন পরীক্ষায় ছেলেদের জ্ঞানে সংকীর্ণতা আনে। পরীক্ষার সময় ছেলেরা বেছেবেছে মুখস্থ করে। 'ক্র্যামিং' তিনি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না।

পরীক্ষা পদ্ধতির প্রতি যতই বিরূপ হন তাঁর আশ্রমের ছেলেরা যখন পরীক্ষা দিত তখন তাদের পরীক্ষার ফল জানবার জন্য তাঁর ঔৎসুক্যের কমতি ছিল না এবং ভাল ফল হলে আনন্দও লাভ করতেন। ১৯০৩ সালে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষ মজুমদার এণ্ট্রেন্স পাশ করলে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন :

> এখানকার এণ্ট্রেন্স ক্লাসের দুটি ছাত্রকে আপনি যেরূপ যত্ন ও দক্ষতা সহকারে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন তাহাতে আপনার নিকট প্রভূত কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। শ্রীমান রথীন্দ্র ও সন্তোষ এ বৎসর এণ্ট্রেন্স দিতে পারিবে এরূপ আশার কোনো কারণ ছিল না—আপনি রথীন্দ্রকে এক বৎসর ও সন্তোষকে এই কয়েকমাসে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার যেরূপ যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে আশাতীত—ইহাতে

অধ্যাপনা সম্বন্ধে আপনার নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের প্রতি আমার একান্ত আস্থা জন্মিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে লেখা আর একখানি চিঠির উল্লেখ করতে লোভ হচ্ছে। অনেকদিন পরের কথা—১৯২৫ সাল। সে বছরে গ্রীষ্মের বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোথাও গেলেন না। ছুটির সময় তিনি কয়েকটি মেয়েকে ইংরেজি পড়িয়েছিলেন, তারা সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। তারা সকলেই তখন ছুটিতে কোথাও না গিয়ে দারুণ গরমে আশ্রমে ছিল গুরুদেবের কাছে ইংরেজি পড়বার আশায়। ১৯২৬ সালে এই মেয়েরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়। গ্রীষ্মের বন্ধের পরে পরীক্ষার ফল যখন প্রকাশিত হল গুরুদেব তখন বিদেশে। অক্টোবর মাস পর্যন্ত তিনি এই মেয়েদের পরীক্ষার ফল জানতে পারেন নি। ৩রা অক্টোবর ১৯২৬, বিদেশ থেকে তিনি শান্তিনিকেতনের তিনটি মেয়েকে একসঙ্গে একখানি চিঠি লিখেছিলেন :

কল্যাণীয়াসু (নুটু, রেখা, ও বাসু)

তোদের চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলুম। এবার এসে অবধি প্রায় কাকেও চিঠি লিখিনি তার কারণ বাদশাহী কুঁড়েমি··· এ চিঠি যখন পাবি তখন তোদের আশ্রম বোধহয় খালি তবু যে কজন আছিস আমার আশীর্বাদ বাঁটোয়ারা করে নিস—হ্যাঁ, একটা খবর জানবার কৌতূহল হয়েছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে কে কি রকম ভাবে উতরালো ? দুজনে ফেল বা দুজনে পাশ, না একজন পাশ—যদি দুজন

পাশ করে থাকে তাহলে কে কে? তারা কি সকলেই নীচের কোঠায়? অমিতা (ঠাকুর) লাবি উভয়েই যদি উত্তীর্ণ হয়ে থাকে তাহলে তারা আশ্রমে থেকেও অবাধে তাদের এই ভূতপূর্ব ইংরেজি শিক্ষকের সম্বন্ধে অপরিসীম ঔদাসীন্য অনুভব করছে। এটা স্বাভাবিক। তোরা এখনও আশ্রমের সীমানায় আছিস বলেই খবর নিতে খবর দিতে পারছিস।

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১৯ সালে আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে কলেজে পড়বার জন্যে কলকাতায় চলে এলাম। বাবা মা শান্তি-নিকেতনে যেমন ছিলেন তেমনি থেকে গেলেন। তাই শান্তি-নিকেতনের সঙ্গে আমার নিত্য যোগাযোগ ছিন্ন হল না। সেই বছরেই বিশ্বভারতী সবেমাত্র অঙ্কুরিত হয়েছে। এই বছর মার্চ মাসে আমরা যখন পরীক্ষা দিচ্ছি তখনও দেখেছিলাম গুরুদেব ক্লাস নিচ্ছেন এবং আশ্রমের ছেলেদের সঙ্গে চলছে তাঁর অনুবাদচর্চা। সম্প্রতি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি দেখলাম। পাণ্ডুলিপিটি হচ্ছে Matthew Arnold-এর সুবিখ্যাত সোরাব ও রুস্তমের গদ্যরূপ। সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি সংগৃহীত হয়েছিল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং বিশ্ব-

ভারতীর কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র প্রখ্যাত শিল্পী পরলোকগত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের কন্যার কাছ থেকে সুবীর মজুমদারের মাধ্যমে। মণি গুপ্তের পরলোকগতা পত্নী রেখা ছিলেন স্বর্গত সন্তোষ মজুমদার মহাশয়ের বোন এবং আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী। রেখারা যখন তৃতীয় বর্গে পড়তেন তখন গুরুদেব তাঁদের 'সোরাব এণ্ড রুস্তম' কবিতাটি পড়িয়েছিলেন। এই সময়ই গুরুদেব এই পাণ্ডুলিপি রেখাকে দিয়েছিলেন। রেখার সহপাঠী ছিলেন আমার প্রতিবেশী সেবক সেন। সেবকের কাছে অনুসন্ধান করে জেনেছি যে ১৯১৯ সালে তৃতীয় বর্গে পড়ার সময় তাঁরা গুরুদেবের কাছে 'সোরাব এণ্ড রুস্তম' সম্পূর্ণই পড়েছিলেন। গুরুদেব প্রথমে কবিতাটি তাঁদের দিয়ে গদ্যে পরিণত করিয়েছিলেন, তারপর প্রত্যেকটি লাইন বাংলায় ব্যাখ্যা করিয়েছিলেন। সেবকরা এই সময় গুরুদেবের কাছে অনুবাদচর্চাও করতেন।

আমি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ক্লাসে যে সমস্ত বাংলা বই পড়েছিলাম তার মধ্যে বাংলায় গুরুদেবের রচিত কবিতা ও গদ্যগ্রন্থ অনেকগুলি ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের দিকপালদের রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন। এছাড়াও আশ্রমবিদ্যালয়ের একাধিক অধ্যাপকের লেখা পুস্তকও

আমাদের পড়তে হত। যেমন সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা', অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'খৃস্ট' এবং শরৎকুমার রায়ের 'শিখগুরু ও শিখজাতি' এবং 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' প্রভৃতি। গুরুদেব চাইতেন সাহিত্যে বৈচিত্র্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটুক।

গোড়া থেকেই বাংলা সাহিত্যের রসটুকু গ্রহণের শক্তি ছেলেরা যাতে অর্জন করতে পারে তারই প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল। সুরু থেকে সাহিত্যকে বিশ্লিষ্ট করে ব্যাখ্যা, অন্বয়, শব্দবিন্যাস প্রভৃতির বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে ভাষাশিক্ষা বালকদের পক্ষে বিতৃষ্ণাজনক করে তোলায় তাঁর অত্যন্ত আপত্তি ছিল। এইজন্যে আমরা নীচের ক্লাসে কেবল 'শিশু' এবং 'কথা ও কাহিনী'র কবিতা মুখস্থ করেছি এবং যে-সমস্ত গদ্যরচনা পাঠ্য থাকত সেগুলি পড়ে রিডিং পড়তে শিখেছি। নিয়মিত লেখার অভ্যাসও আমাদের করানো হত। অভিনয়ের উপযোগী গল্পগুলি আমরা অভিনয় করতাম। যখন পঞ্চমবর্গে উঠলাম তখনই প্রথম বাংলাভাষা-শিক্ষার এক নূতন জগতে প্রবেশ করলাম। এই সময়েই প্রথম ব্যাখ্যা অন্বয় শব্দবিন্যাসের চর্চা শুরু হল। আমাদের পাঠ্য ছিল অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ'। শিক্ষক সত্যজ্ঞানবাবু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন—পড়াবার সময় তিনি ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্বের উপর জোর দিতেন। চারুপাঠের 'প্রচণ্ড মার্তণ্ড তাপে তাপিত হইয়া' প্রভৃতি ভাষা নিয়ে যে কি রকম হিমসিম খেয়েছিলাম

এখনও তা ভুলিনি। এই বছরে আমাদের Rapid Reader ছিল শরৎ বাবুর 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' এবং 'শিখগুরু ও শিখজাতি'—সন্তোষবাবু পড়াতেন। আর পড়িয়েছিলেন গুরুদেবের 'কাহিনী' এবং তখনকার রীতি অনুযায়ী 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' আমাদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন। সন্তোষবাবু নিজে ভাল অভিনেতা ছিলেন। এখনও যেন তাঁর মুখে শোনা কর্ণের উক্তি—"পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্, কৌরব কৌরব—ঈর্ষা নাহি করি কারে"—আমার মনে বাজে। চতুর্থ বর্গে উঠে প্রথমে কিছুদিন কালিদাসবাবুর কাছে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়েছিলাম। কালিদাসবাবু অপূর্ব পড়তেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। সেই সঙ্গে 'ইরম্মদ বেগে' বা 'উর দেবী অমৃতভাষিণী' প্রভৃতি খটোমটো শব্দগুলির মানে নিয়ে যে কী বিপদে পড়তাম তাও মনে পড়ে। মজাও কম হত না। এখনও মনে আছে আমার সহপাঠী বন্ধুবর প্রমথ বিশী ক্লাসে প্রায়ই মেঘনাদবধ কাব্যের বিশেষ্যকে ক্রিয়ারূপে ব্যবহারপদ্ধতির প্যারডি করে বলত "টেবিলিল সূত্রধর কাঁঠালের কাঠে।"

১৯১৪ সালে আমরা যখন চতুর্থ বর্গে পড়ি তখন গ্রীষ্মাবকাশের পর ক্ষিতিমোহনবাবু আমাদের বাংলা ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন। তৃতীয় বর্গেও তিনি আমাদের বাংলা পড়িয়েছিলেন। এই দুই বছরে আমরা তাঁর কাছে গুরুদেবের যে-সব বই পড়েছিলাম তা হল পাঠসঞ্চয়, সমাজ, স্বদেশ ও সংকল্প এবং নৈবেদ্য। তৃতীয় বর্গে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের বই আমাদের

পাঠ্য ছিল। এইখানেই সমাপ্তি। পরের বছর থেকে রবীন্দ্রনাথের কোনো বই আর আমাদের পড়তে হয়নি। দ্বিতীয় বর্গে আমরা বাংলা পড়েছিলাম রমেশ পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে। তিনি পড়াতেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' এবং চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাদম্বরী'। সঙ্গে ছিল প্রবেশিকা কোর্সের একটি বাংলা ব্যাকরণ এবং রচনা পদ্ধতি। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে হরিচরণবাবু পড়িয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' ও 'কপাল কুণ্ডলা'। মুখে মুখে তিনি টেস্ট পেপার থেকে প্রশ্নোত্তর করাতেন।

একটা প্রচলিত কথা আছে 'যার শেষ ভাল তার সব ভাল'। তৃতীয় বর্গে ক্ষিতিবাবুর কাছে আমাদের রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তখন একমাত্র শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার চক্রবর্তী ছাড়া শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অপর কোনো অধ্যাপক আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের মতো রবীন্দ্রসাহিত্যের এত বড় সমজদার আর ছিলেন না। অজিতকুমার যেমন রবীন্দ্রকাব্যের উপর 'কাব্য পরিক্রমা' লিখে যশস্বী হয়েছিলেন, ক্ষিতিমোহনও তেমনি 'বলাকা কাব্যপরিক্রমা' লিখে যশস্বী হয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্য পঠনে ক্ষিতিমোহনবাবু একাই আসর মাত করে রেখেছিলেন। কেননা অজিতবাবু সাধারণত ইংরেজিই পড়াতেন; তিনি কোনোদিন বাংলা পড়িয়েছেন বলে আমার মনে পড়ে না।

রবীন্দ্রসাহিত্য পড়াবার সময় ক্ষিতিবাবুর জ্ঞানের গভীরতা

ও সাহিত্যরসবোধ আমাদের একেবারে মুগ্ধ করে রাখত। গল্প আর গল্প—তাঁর পড়াবার মধ্যে ছিল সরস গল্পের ছড়াছড়ি। তাঁর 'নৈবেদ্য' বইখানির মার্জিনে যে-সব নোট লেখা থাকত শুনেছিলাম গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনা করবার সময় সে-সব নোট তিনি করেছিলেন। ক্লাসে পড়াবার সময় সেই নোটগুলি তিনি আমাদের বিতরণও করতেন। উপনিষদ থেকে অনুরূপ ভাবের প্রাসঙ্গিক মন্ত্রগুলি এবং কবীর ও রজ্জব প্রভৃতি মধ্য-যুগের সন্তদের দোঁহাও তিনি আমাদের দিতেন। যেমন শোনবার মতো ছিল তাঁর উদাত্ত সুরে উপনিষদের মন্ত্র আবৃত্তি তেমনিই অসামান্য ছিল তাঁর উপমাপ্রয়োগ আর গল্প বলার রীতি।

১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে আমরা তখন দ্বিতীয় বর্গে পড়ি। বসন্তকাল। গুরুদেবের জাপান যাবার মাস কয়েক আগের কথা। তখন কিছুদিন বিনোদন পর্বে গুরুদেব 'বলাকা' গ্রন্থখানি থেকে কোনো কোনো কবিতা পড়িয়েছিলেন। একদিন হঠাৎ সেই সান্ধ্য ক্লাসে আমাদেরও ডাক পড়ল। দেহলীর ছাদে গুরুদেবের ক্লাস বসেছিল। সেদিন স্বয়ং গুরুদেবের মুখে 'শাজাহান' কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শোনবার সুযোগ হয়েছিল, কেবল সেইদিনই নয়, ব্যাখ্যা তারপর কয়েকদিন ধরেই শুনেছি।

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গুরুদেব নানা প্রশ্ন করতেন। আমরা যদিও ছোট ছিলাম তবু ক্ষিতিবাবুর ক্লাসে বাংলা পড়ার গুণে এলোমেলো হলেও কিছু না কিছু উত্তর দিতাম, চুপ করে

থাকতাম না। গুরুদেব অনেক সময় বলতেন, "হ্যাঁ, কাছাকাছি গেছিস, তবে আর একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার।" বলে স্বকীয় ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করতেন। অত্যন্ত কঠিন দার্শনিক তত্ত্বও কত সহজে তাঁর অন্তরের কাব্য ও কৌতুকরসের অভিসিঞ্চনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে শুনতাম। সময়ের গতি এবং রূপহীন মরণকে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে সাজিয়ে সৌন্দর্যের নীরবতার মধ্যে তাজমহলের সৃষ্টির উপরই তিনি 'শাজাহান' কবিতাটি লিখেছিলেন। সেই দুরূহ তত্ত্বকে তিনি আমাদের মতো অল্প বয়সের ছেলেদের কত সোজা ও সুন্দর করে বোঝাতেন এখন তা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়।

একথা আমি অনেকবার বলেছি যে আশ্রমবিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্লাসে যে পাঠ নিত সেইটুকুতেই তাদের শিক্ষা সমাপ্ত হত না। বস্তুতপক্ষে ক্লাসের বাইরেই তারা ক্লাসের চেয়ে অনেক বেশি শিখত। প্রতি বুধবারে মন্দিরে উপাসনা, সাহিত্যসভা, অভিনয়—এ সবই তাদের শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে বলি, মন্দিরে যখন গুরুদেব উপাসনা করতেন, যখন ছাত্রদের সাহিত্যসভা পরিচালনা করতেন, যখন নিজে অভিনয় শেখাতেন তাদের, তখন তাঁকে কাছ থেকে দেখা একটা অসামান্য অভিজ্ঞতা ছিল। মন্দিরে গুরুদেব যে-সব ভাষণ দিতেন যাঁরা সে-সব ভাষণ না শুনেছেন তাঁরা বাংলা সাহিত্যের রসের একটা দিক থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমরা

তখন ছোট, যে-সব দুরূহ বিষয়ের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সাবলীল-ভাবে অনর্গল করে যেতেন তিনি, তার সবটা হয়তো আমরা বুঝতাম না, কিন্তু আমাদের কানে যেন তা কবিতার মতো বাজতে থাকত। আবেগের বসে কত সময় গুরুদেব ভাষণের মধ্যেই গান গাইতেন, উপনিষদের মন্ত্র যে কত আবৃত্তি করতেন তার ইয়ত্তা ছিল না।

অভিনয় ও সাহিত্যচর্চা

আশ্রমবিদ্যালয়ে গুরুদেব যখন নাটক অভিনয় করাতেন তখন দীর্ঘ দিন ধরে নাটকের মহড়া চলত। এই মহড়ায় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের অনেকেই উপস্থিত থাকতেন। মহড়ায় নাটকের গান ও সংলাপ শুনে শুনে আমাদের প্রায় মুখস্থ হয়ে যেত। ১৯১১ সালের বসন্তোৎসবে শান্তিনিকেতনে 'রাজা' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। তাতে রাণী সুদর্শনা সেজেছিলেন সুধীরঞ্জন দাস। গুরুদেব তাঁকে যে কী যত্নে প্রত্যেকটি সংলাপ বলতে শেখাতেন দিনের পর দিন, দেখে অবাক হতে হত। বিশেষ করে একটি সংলাপ আমার মনে পড়ে। "তুমি ভয়ানক, তুমি কালো, তুমি কালো; ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কুলহারা সমুদ্রের মতো কালো।" সুধীদা কালো ছিলেন। আশ্রমের মধ্যে পথে-ঘাটে তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই আমরা ছোটরা সমস্বরে 'তুমি কালো' ইত্যাদি বলে চিৎকার করে উঠতাম। সুধীদা আমাদের দৌড়ে ধরতে আসতেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথ শুধু নিজেই চেষ্টা করেন নি, অন্যদের চেষ্টাকেও চিরদিন স্বাগত জানিয়েছেন। যুবক বয়স থেকে গুরুদেব যে কত উদীয়মান সাহিত্যিকের রচনা সংশোধন করেছেন তার কোনো হিসাব নেই। অনেক সময়েই সংশোধন করতে গিয়ে লেখাটি বদলাতে বদলাতে সম্পূর্ণ একটি নতুন লেখা হয়ে উঠত।

আশ্রমের ছেলেদের মধ্যে যারই একটু লেখার হাত থাকত গুরুদেব তাকেই নানা সাহায্য করতেন। লেখা তো সংশোধন করে দিতেনই, লেখা উপযুক্ত মনে করলে পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থাও করে দিতেন।

আমার সহপাঠী প্রথিতযশা সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী শৈশবেই শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন—তাঁর সাহিত্যিক-প্রতিভা শিশুকাল থেকেই গুরুদেবের স্নেহচ্ছায়ায় বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছিল।

তরুণ বয়সে তিনি আশ্রমে অভিনয়ের জন্য 'রথযাত্রা' নামে যাত্রা লিখেছিলেন। সেটি সংশোধন করতে গিয়ে তার ভাবটি নিয়ে গুরুদেব লিখলেন 'রথের রশি' নাটক। নাটকের ভূমিকায় গুরুদেব লিখেছিলেন যে তিনি তাঁর একটি ছাত্রের লেখা থেকে এই ভাবটি পেয়েছেন। সে নাটক আমরা অভিনয়ও করেছি।

আমার আর একটি সহপাঠী কবি সতীশচন্দ্র রায়ের কবিতাও গুরুদেবকে সংশোধন করতে দেখেছি। গুরুদেবের লাল কালিতে সংশোধন করা সতীশের কবিতাগুচ্ছের একটি

খাতা বন্ধুবর ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের সংগ্রহে আছে। গুরুদেব একবার এমন সংশোধিত কবিতা রামানন্দবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বন্ধু সতীশের কবিতা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

একদিকে যেমন এই ভাবে সাহায্যের হাতখানি প্রসারিত ছিল, অন্যদিকে তেমনি গুরুদেব ছাত্রদের কাঁচা লেখার তীব্র সমালোচনা করতে দ্বিধা করতেন না, এই সব উঠ্‌তি ছাত্র সাহিত্যিকদের পরিশ্রমবিমুখ দেখলে কঠোর তিরস্কার করতে তাঁর বাধত না। ছাত্রদের সাহিত্যসভায় যখন সভাপতিত্ব করতেন তখন প্রয়োজনে তাঁকে কঠোর হতে দেখেছি। তাই দেখি যে মানুষ একদিকে কুসুমের চেয়ে কোমল ছিলেন, সেই মানুষই বজ্রের চেয়ে কঠোর হতে পারতেন। ক্লাসে পড়া না পারলে কখনও বকতেন না, কিন্তু সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে ত্রুটি সইতে পারতেন না। অভিনয়ের পার্ট মুখস্থ না করে রিহের্সালে এলেও দেখেছি ভয়ানক রেগে যেতেন।

আমাদের আশ্রম থেকে অনেকগুলি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশিত হত। যেমন—আদ্যবিভাগ থেকে 'শান্তি', মধ্যবিভাগ থেকে 'বীথিকা', 'বাগান' ও 'প্রভাত', শিশুবিভাগ থেকে 'শিশু'। এ ছাড়া আদ্য ও মধ্যবিভাগের বড় ছেলেরা মিলে 'The Ashrama' নামে একটি হাতে লেখা ইংরেজি পত্রিকাও মাসে মাসে নিয়মিত প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকাগুলির জন্য গুরুদেবের লেখা সংগ্রহ করা কিছুমাত্র কঠিন কাজ ছিল না।

আশ্রমগুরুর যে সব কবিতা, গান বা প্রবন্ধ এঁরা পেতেন তার কোনোটাই পূর্বপ্রকাশিত নয়। সবই ছিল অপ্রকাশিত। এইসব হাতে লেখা পত্রিকাগুলি এখনও শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরিতে আছে, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে গুরুদেবের স্বহস্তে লেখা রচনাগুলির পাতা সবগুলি থেকেই নিঃশেষে কেটে নেওয়া হয়েছে। হাতে লেখা পত্রিকার জন্য গুরুদেবের লেখা সংগ্রহ করার ব্যাপারে আমার একটি গল্প মনে পড়ছে। গল্পটি শুনেছিলাম নরেন নন্দীদার কাছ থেকে। অতুলেন্দু সেন, তপন-মোহন চট্টোপাধ্যায়, সরোজরঞ্জন চৌধুরী প্রভৃতি জনাকয়েক 'শান্তি' পত্রিকার পরিচালক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গিয়ে একবার ধরেন যে ঠাকুরবাড়ীর রুচি এবং প্রাচীন ঐতিহ্য ও আবহাওয়া সম্বলিত তাঁর একটি জীবনী তাদের পরিচালিত শান্তি পত্রিকার জন্য লিখে দিতে হবে। তার উত্তরে দ্বিজেন্দ্র-নাথ বলেছিলেন, "আরে আমার 'লাইফ' দিয়ে কি হবে? লাইফ হচ্ছে রবির। তোমরা সব রবিকে গিয়ে ধরে পড়।" অতুলদারা তখন গুরুদেবকে গিয়ে ধরলেন, "বড়বাবুমশাই বলে দিয়েছেন 'শান্তি' পত্রিকার জন্য আপনার 'লাইফ' চাই।" গুরুদেব চোখ বড় করে স্মিত হেসে বললেন, "সে কি রে! আমার লাইফ নিলে তো ফাঁসি যাবি। আমি এমন কি দোষ করলাম যার জন্য আমার লাইফ তোরা দাবি করে বসলি?" ছেলেরা তখন মাথা চুলকে ভ্রম সংশোধন করল, "না সে লাইফ নয়, আমরা জীবনী চাই।" মুখে ঠাট্টা করলেন বটে, কিন্তু

'শান্তি' পত্রিকার জন্য তিনি 'জীবনস্মৃতি' লিখতে আরম্ভ করলেন। জীবনস্মৃতির প্রথম পরিচ্ছেদটি লিখে 'শান্তি'র সম্পাদকের হাতে দিয়ে বললেন, "আজকেই তোদের কাগজে এটা ফেয়ার করে তুলবি। কালকেই আমাকে ফেরৎ দিতে হবে।" নরেনদার হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর। তাঁর কাছে শুনেছিলাম যে অতুলেন্দুদা তাঁর শরণাপন্ন হলে সেই দিন এবং সেই রাত্রি জেগে তিনি জীবনস্মৃতি লেখাটি 'শান্তি' পত্রিকার সংখ্যায় ফেয়ার করে তুলেছিলেন। সুতরাং গুরুদেবের সুবিখ্যাত এই 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম অংশ সর্বপ্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ছেলেদের হাতে লেখা পত্রিকা 'শান্তি'তে। শান্তি পত্রিকার পরিচালকদের এটা কম গৌরবের বিষয় ছিল না!

বিজ্ঞান ও গণিতচর্চা প্রসঙ্গ

সকলেই জানেন যে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য বহুবিধ শিক্ষার আয়োজন হয়েছিল সে যুগে। রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। বিভিন্ন ইংরেজি পত্র-পত্রিকা থেকে বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি দাগ দিয়ে জগদানন্দবাবুকে পাঠাতেন সেগুলি ছেলেদের বাংলায় বোঝাবার জন্য। ত্রিপুরার মহারাজার টাকায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যে বিরাট টেলিস্কোপটি কিনে দিয়েছিলেন, সেটা আমরা বরাবর দেখেছি একা জগদানন্দ-বাবুই ব্যবহার করতেন। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ছেলেদের

দিয়ে সেই বিরাট টেলিস্কোপটি বাইরে বের করে গৌরপ্রাঙ্গণে এনে জগদানন্দবাবু ছেলেদের গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতেন। সন্ধ্যায় জগদানন্দবাবুর এই জ্যোতির্বিদ্যার ক্লাসে নেপালচন্দ্র রায় প্রভৃতি প্রবীণ অধ্যাপকরাও যোগদান করতেন।

গুরুদেবের কাছে গণিত বিষয়টি বিভীষিকার মতো ছিল। কিন্তু গণিত শেখাবার ব্যাপারে তিনি জগদানন্দবাবুকে যথারীতি উপদেশ দিতে বিরত থাকেন নি। এই প্রসঙ্গে শিকাগো থেকে জগদানন্দবাবুকে একটি তারিখবিহীন চিঠিতে লিখেছেন :

> চিকাগোয় থাকতে সেখানকার একটি ভালো বিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে দেখবার জিনিস ঢের আছে। কিন্তু তাদের সমস্তই বহু ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা ; দেখে আমাদের পক্ষে বিশেষ লাভ নেই। কেবল অঙ্ক শেখাবার একটা যা প্রণালী দেখলুম সেইটে তোমাকে লিখছি। এরা ক্লাসে একটা খেলার মতো করে—সেটা হচ্ছে ব্যাঙ্কিং, তাতে পুরোপুরি ব্যাঙ্কের কাজের সমস্ত অভিনয় হয়। চেকবই, ভাউচার, হিসাবপত্তর সবই আছে। ছেলেদের কারো বা চিনির ব্যবসা, কারো বা চামড়ার—সেই উপলক্ষে ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাদের লেনাদেনা এবং তার লাভ লোকসান ও সুদের হিসাব ঠিক দস্তুর মতো রাখতে হচ্ছে। এতে অঙ্ক জিনিসটা এরা গোড়া থেকেই সত্যভাবে দেখতে

পায়। ছেলেরা খুব আমোদের সঙ্গে এই খেলা খেলছে। তোমার মনে আছে কিনা বলতে পারি নে, কিন্তু আমি বহুকাল পূর্বে আমাদের বিত্তালয়ের অঙ্কের ক্লাসে এই দোকান রাখার খেলা চালাবার চেষ্টা করেছিলুম। গণিত শাস্ত্রে আমার বিত্তার পরিমাণ গণনায় অতি যৎসামান্য বলেই আমি এই জিনিসটাকে খাড়া করে তুলতে পারলুম না।···কিন্তু অঙ্ক জিনিসটা কি এবং তার ভুল জিনিসটা যে কেবল নম্বর কাটার বিষয় নয়, সেটা যে যথার্থ ক্ষতির কারণ, এটা খেলার ছলে ছেলেদের দেখিয়ে দিলে সেটা ওদের মনে গাঁথা হয়ে যায়। ছোট ছোট কাপড়ের বস্তায় বালি পুরে অনায়াসে এই খেলার আয়োজন করা যেতে পারে—অবশ্য খাতাপত্র ঠিক দস্তুর মতো রাখতে শেখাতে হয়। এই জিনিসটাতে ওদের হাত দুরস্ত হলে প্রত্যেক ঘরে আমরা Deposit-এর কাজ স্বতন্ত্র করে চালাতে পারি। প্রথমটা এটা গড়ে তুলতে একটু ভাবতে এবং খাটতে হয় কিন্তু তার পরে কলের মতন চলে যাবে। আতার বীচি, তেঁতুলের বীচি দিয়ে টাকা পয়সার কাজ চালাতে পার, কাগজ কেটে কতগুলি নোটও তৈরী করে নিতে পার—এতে ওদের আমোদও হবে, শিক্ষাও হবে। এই জিনিসটা একটু ভেবে দেখো। এদের ইস্কুলে এই জিনিসটার নূতন প্রবর্তন হয়েছে—আমরা এদের অনেক আগে এই প্রণালীর কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু আমরা

বাঁধা রাস্তার বাইরে কিছুই করতে পারলাম না—আর এরা অনায়াসে এগিয়ে যাচ্ছে—এইটে দেখে আমার মনে দুঃখ বোধ হল।

সমবায় ভাণ্ডার

এই সময়ে থেকেই আশ্রমবিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্য শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে একটি কো-অপারেটিভ স্টোরস্ খুলবার ইচ্ছা গুরুদেবের মনে জেগেছিল। সবাইকে নিয়ে তার প্রস্তুতিই চলেছিল অনেকদিন ধরে। গুরুদেব স্বয়ং সমবায় নীতি সম্বন্ধে ছেলেদের বুঝিয়ে বলতেন। সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি'তে এমন একটি সভার সুন্দর বিবরণ আছে।

অবশেষে ১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতনে কো-অপারেটিভ স্টোরসের কাজ সুরু হল। প্রথম যে এগারো জন ডাইরেক্টর হলেন তাঁদের নামগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে স্বয়ং গুরুদেব সভাপতি ছাড়া বাকী দশ জনের মধ্যে পাঁচজন অধ্যাপক আর পাঁচজন ছাত্র। ছেলেরা খুব উৎসাহের সঙ্গে তাদের নিজেদের জিনিস মনে করে দোকানের কাজ আরম্ভ করেছিল। তারা নিজেরাই ছিল ক্রেতা নিজেরাই ছিল বিক্রেতা। মূলধনও ছিল তাদের নিজেদেরই। বর্তমানে এই কো-অপারেটিভ স্টোরস্ অন্য রূপ নিয়েছে। তার নূতন নাম হয়েছে 'বিশ্বভারতী সমবায় ভাণ্ডার'। কিন্তু তার সভ্য তালিকার মধ্যে ছাত্রদের নামগন্ধও পাওয়া যায় না। এমনি

করে নানা ছোট ছোট রদবদলের মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং আদর্শের একে একে বিলুপ্তি ঘটেছে বলে আমি মনে করি। আপাত দৃষ্টিতে যে পরিবর্তন তুচ্ছ বা গুরুত্বহীন বলে গণ্য হয়েছে শুধু সেইগুলিই একত্রে মেলালে দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথের মূল আদর্শের কি বিরাট রূপান্তর ঘটে গেছে। গুরুদেব প্রবর্তিত আশ্রম বিদ্যালয়কে বর্তমানে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবন ও গুরুদেব

বিশ্বভারতীর আমলে যখন কলেজের ক্লাসগুলি খোলা হয় তখন তিনি বিদ্যালয়ের সংলগ্ন দেহলী ছেড়ে উত্তরায়ণে বাস করতে সুরু করেন বলে ছেলেদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আগের মতো আর ঘনিষ্ঠ ছিল না কিন্তু তিনি যখন তাঁর কোনো কোনো নূতন লেখা পড়তেন তখন শ্রোতাদের মধ্যে স্কুলের উপরের শ্রেণীর ছেলেরা এবং কলেজের ছেলেরাও থাকত। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ক্লাস নেওয়া থেকে একেবারে বিরত থাকেন নি। শুনেছি যে বছর তাঁর তিরোধান ঘটে সে বছরেও তিনি বিশ্বভারতীর কলেজে বাংলা অনার্স ক্লাস খোলা হলে অনার্স ক্লাসের ছাত্রদের পাঠ্য তাঁর নিজের কবিতা পড়িয়েছিলেন। তাঁর নিজমুখে তাঁর কবিতার ব্যাখ্যা শোনার সৌভাগ্য আমাদেরই মতো বিশ্বভারতীর গোড়ার আমলের ছেলেদেরও হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের

সম্পর্ক মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। শ্রীভবনের মেয়েরা এবং আশ্রমবাসী বধূরা প্রায় প্রতিদিন বিকেলে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেন—তিনি সব সময় হাসিমুখে তাঁদের অভ্যর্থনা করতেন এবং গল্পগুজব করতে ভালবাসতেন।

গুরুদেব একটি তারিখবিহীন চিঠিতে জগদানন্দবাবুকে লিখেছেন,

> এই আশ্রমে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের গভীর যোগ কেননা এখানে উভয়েই ছাত্র—এখানে বিদ্যার সঙ্গে ধর্মের ভেদ নাই কেননা উভয়েই এক লক্ষ্যের অন্তর্গত। এখানে জীবনের সাধনা নদীর স্রোতের মত সমগ্রভাবে সচল; স্নানাহার, পাঠাভ্যাস, খেলা, উপাসনা সমস্তই সাধনার পথে প্রবাহিত। এখানে শিক্ষক যে শিক্ষাদান করচেন সে তাঁর ব্যবসায়গত কর্তব্য বা নৈতিক কর্তব্য নয়, সে তাঁর সাধনা।

আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে গুরুদেব ওতপ্রোত ভাবে মিশেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থাকলে তাঁর অস্তিত্ব সব কিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে থাকত। সুতরাং গুরুদেবকে আমরা আকাশ-আলো-বাতাসের মতো সহজে পেয়েছিলাম। তথাপি আজ পরিণত জীবনের ভূমিতে দাঁড়িয়ে নিজের মনের দিকে যখন ফিরে তাকাই তখন দেখি সেই বাল্যকালের অতি সহজ ও অনায়াস পাওয়ার মধ্যে গুরুদেবের ছবিটি আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে কোথাও কোথাও অত্যন্ত উজ্জ্বল

হয়ে ফুটে আছে। নানা পটভূমিতে তাঁকে দেখেছি—সে দেখা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। আজ ভাবি শুধু শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই আমরা সেদিন জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করি নি, এই আশ্রমের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের নিত্যউপস্থিতি আমাদের শিক্ষাকে প্রতিনিয়ত পূর্ণ করে তুলেছে। আমার ভাষণ শেষ করবার আগে আমার স্মৃতিতে সঞ্চিত কয়েকটি টুকরো ঘটনার উল্লেখ করব, না হলে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের ছবিটি সম্পূর্ণ হবে না।

আরও কয়েকটি স্মৃতিচিত্র

১৯১৪ সাল ফাল্গুন মাস হবে গুরুদেব তখন সভ্য বিলেত থেকে ফিরেছেন, নোবেল পুরস্কারও পেয়ে গেছেন। শান্তি-নিকেতনে 'অচলায়তন' অভিনয়ের মহড়া নিয়ে খুবই ব্যস্ততা চলেছে, এই সময় আমরা প্রায় পঞ্চাশজন ছাত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে সিউড়ির মেলায় বীরভূম জেলার আন্তঃস্কুল স্পোর্টসে দারুণভাবে জিতে এলাম। আমাদের মধ্যে ছোট, বড় মাঝারি তিন দলেরই ছেলে ছিল এবং সব সমেত তিরিশটি পুরস্কারের মধ্যে সাতাশটি পুরস্কারই আমরা পেয়েছিলাম ; বলা চলে মোটের উপর সব পুরস্কারই আমরা একেবারে লুটেপুটে নিয়ে এসেছি। সিউড়ি থেকে অতি প্রত্যুষে আমরা বোলপুর স্টেশনে এসে নামলাম। একটি শীল্ড, একাধিক কাপ, সংখ্যাতীত মেডেল এবং আরও কত নানাবিধ রকমের পুরস্কারের

সম্ভার ছিল আমাদের সঙ্গে। সারা গাড়িতে আমরা গান গেয়েছিলাম, "ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার, এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে ঢাল।" গানের 'হার' শব্দটা নিজেরাই বদল করে 'ঢাল' কথাটা বসিয়ে নিয়েছিলাম আমাদের জয়করা গোল শীল্ডটিকে বোঝাবার জন্য। সন্তোষবাবুর সঙ্গে ঐ গানটি গাইতে গাইতে পদব্রজে বোলপুর স্টেশন থেকে ভুবনডাঙায় এসে পৌঁছলাম। তখনও অন্ধকার ছিল। ভুবনডাঙায় এসে আমরা অন্য গান ধরলাম :

"এনেছি মোরা এনেছি মোরা
রাশি রাশি লুটের ভার"

আশ্রমে সদ্য অভিনীত 'বাল্মীকি প্রতিভা'র এই গানটি ছেলেদের প্রায় সকলেরই মুখস্থ ছিল। গান ধরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা অধিকাংশই ঘুম থেকে উঠে দৌড়ে এসে রাস্তাতেই আমাদের অভ্যর্থনা করেছিল এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গানে যোগদান করেছিল। গানটি গাইতে গাইতে আমরা আশ্রমে প্রবেশ করে শালবীথিতে এসে যখন উপস্থিত হয়েছি তখন দেখি গুরুদেব প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। আমাদের দেখে মুখভরা হাসি নিয়ে একটু দাঁড়ালেন। গুরুদেবের সামনে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করবার আগে আমরা সমস্বরে গগনভেদী চিৎকার করে বলে উঠলাম—"ওয়া গুরুজি কি ফতে।" ধ্বনিটি সন্তোষবাবু সম্প্রতি আমাদের শিখিয়েছিলেন। গুরুদেবের হাসিভরা মুখখানি কঠিন হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

"কি ব্যাপার, এত উল্লাস কেন?" আমরা উত্তর করেছিলাম, "আজ আমরা জয়ী, সিউড়ি থেকে সমস্ত প্রাইজ লুটেপুটে নিয়ে এসেছি।" তার উত্তরে গুরুদেব বললেন, "তাই তোমাদের বড্ড অহংকার হয়েছে দেখছি। তোদের একবার হারার দরকার। জিতে আনন্দ তো সকলেই করে তার মধ্যে এমন কিছু বাহাদুরি নেই। কোনোদিন হেরে যদি এই রকম আনন্দ করতে পারিস সেদিন বুঝব আমার ছেলেরা সত্যিকারের মানুষ হয়েছে।"

একবার শান্তিনিকেতনে খুব জ্বরের প্রকোপ দেখা দিল, প্রায় এপিডেমিকের মতো। তখন গুরুদেব প্রত্যেক ছেলেকে পঞ্চ-তিক্ত খাওয়ানো প্রবর্তন করেছিলেন। ছেলেরা অনেকে খেত না, ফেলে দিত। একথা গুরুদেবের কানে উঠল। তিনি তখন শান্তিনিকেতনের দোতলায় থাকতেন। সমস্ত ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। ছেলেরা সব ছাতিমতলার দেবদারু বীথিতে এসে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াল। গুরুদেব স্বয়ং তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে জনে জনে এই পঞ্চতিক্ত খাইয়েছিলেন। দু-তিন দিন এরূপ চলেছিল। তারপরে গুরুদেব আর আসতেন না। ছেলেরা এই পঞ্চতিক্ত খাওয়ার ব্যাপারে গুরুদেবের নির্দেশ মেনে নিয়েছিল। এরপর দেবদারু বীথিতে অনুরূপ লাইন করে ডেয়ারীতে গরুর দুধ দুইয়েই তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কিছুদিন ছেলেদের ফেনাযুক্ত সদ্য-দোয়া কাঁচা গরম দুধ খাওয়াতেন।

১৯১৭ সালের কথা। শীতকাল। গুরুদেব তখন দেহলীতে আছেন। সভ্য সভ্য জাপান ও আমেরিকা সফর শেষ করে আশ্রমে ফিরেছেন। বুধবার, প্রত্যুষে গুরুদেব স্বয়ং মন্দির করবেন। সকাল সাড়ে ছটায় মন্দির হবার কথা। আমরা তখন বড় ছেলেরা দেহলীর সন্নিকটে বীথিকা গৃহে থাকতাম। আগের রাত্রেই ঠিক হয়েছিল পরদিন ভোর চারটের সময় উঠে আমরা বীথিকা ঘরের ছেলেরা দল বেঁধে গোয়ালপাড়ায় খেজুর রস খেতে যাব। গৃহাধ্যক্ষ জগদানন্দ বাবুরও অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। পরদিন প্রত্যুষে বীথিকা ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা দেহলীর পাশ দিয়ে গোয়ালপাড়ার রাস্তায় গিয়ে উঠব। গুরুদেব দেহলীতে থাকতেন বলে আমরা কোনো রকম গোলমাল না করে অত্যন্ত নিঃশব্দে যাচ্ছিলাম। নতুন বাড়ি ছাড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম দেহলীর ছাদে স্ট্যাচুর মতন গুরুদেব খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন। তাই না দেখে আমরা অতি সন্তর্পণে ফিরে এসে শান্তিনিকেতন বাড়ির পাশ দিয়ে গেট অতিক্রম করে গোয়ালপাড়ার রাস্তায় গিয়ে উঠলাম। প্রাণভরে জিরেন কাটের রস খাওয়া হল সবাই মিলে। ফিরবার সময় সবে গোয়ালপাড়ার ব্রীজটা পার হয়েছি এমন সময় আমাদের কানে এল মন্দিরের ঘণ্টা। পদব্রজে আশ্রমে ফিরতে না ফিরতে মন্দির শেষ হয়ে যাবে মনে করে আমরা সেখান থেকেই ছুটতে আরম্ভ করলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে যখন মন্দিরের গেটের সামনে এসে উপস্থিত হলাম তখনও গুরুদেব একমনে মন্দিরের

ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছেন। জানি না হয়ত আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। পোষাক-পরিচ্ছদ ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ধীরেসুস্থে মন্দিরে গিয়ে উপবেশন করলাম। আমাদের মধ্যে জিতেন চৌধুরী, শিবদাস প্রভৃতি গানের দলের ছেলেরাও ছিল। তাদের না দেখে দিনুবাবু একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তারা উপস্থিত হলে দিনুবাবু বড় বড় চোখে কটমট করে তাকিয়ে তাঁর পাশে বসতে নির্দেশ দিলেন। তখনও তারা হাঁপাচ্ছিল। দিনুবাবুকে দেখলাম বেশ একটু বিরক্তও হয়েছেন। 'অসতো মা সদগময়' মন্ত্রটি উচ্চারণ করে গুরুদেব তাঁর ভাষণ শেষ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল ছেলেদের সমবেত কণ্ঠে শেষ গান। গানের শেষে সকলে উঠে পড়লেন। গুরুদেব হাতজোড় করে মন্দিরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তখন আরম্ভ হল গুরুদেবকে প্রণাম করার পালা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি যখন আস্তে আস্তে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম তখন তিনি চিরাভ্যাস মতো হাতজোড় করে প্রতিনমস্কার না করে আমার মাথার চুল একটু টেনে দিয়ে বললেন, "হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে মন্দির করা যায় না।" আমাদের এই দৌড়ে আসা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।

আমাদের আশ্রম-সম্মিলনীর পেনালকোডে মন্দিরে না যাওয়াটা একটা গর্হিত অপরাধ ছিল। বিচারসভায় কঠিন শাস্তি পেতে হত। গুরুদেব নিজেও সকল ছেলেরা যাতে সমাহিত চিত্তে মন্দিরে উপস্থিত থাকে সে বিষয়ে অত্যন্ত

সচেতন ছিলেন। শুনেছি, বিশ্বভারতীর আমলে গুরুদেব তখন বার্ধক্যজনিত রোগের ভারে আক্রান্ত। নিয়মিত মন্দির করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এমন সময় একদিন তাঁর কানে গেল যে বিশ্বভারতীর ছেলেদের মধ্য মন্দিরের যাবার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রকাশ পাচ্ছে। একথা শুনবামাত্রই তিনি উত্তেজিত হয়ে শয্যা ত্যাগ করে আলুকে বললেন, "এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে আয়, আমি মন্দিরে যাব।" সকলেই হকচকিয়ে গেল। এমন কারও সাধ্য ছিল না যে গুরুদেবকে নিবারণ করে। গুরুদেব মন্দিরে এলেন, খুব ছোট্ট একটি ভাষণ দিয়ে মন্দির শেষ করে গৃহে ফিরে গিয়ে আবার শয্যাগ্রহণ করলেন। মন্দিরের সেদিনকার ভাষণে তিনি ছেলেদের বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে বর্জন কর সেটা আমি সইব কিন্তু এখানে থেকে আমাকে আঘাত করো না। মন্দিরের প্রতি শৈথিল্য আমাকে অত্যন্ত বেদনা দেয়। আমার পক্ষে সে আঘাত সহ্য করা অত্যন্ত পীড়াদায়ক।"

এই বছরেরই আর একটা ঘটনা। আমরা ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ি। আশ্রমবিভাগের ছাত্র হিসাবে বীথিকাগৃহে থাকি। গুরুদেব তখন আমাদের কাছেই দেহলীতে থাকতেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা শালবীথি দিয়ে বরাবর জগদানন্দবাবুর ক্লাসে মাধবীগেটের দিকে পশ্চিম মুখে যাচ্ছিলাম। দূর থেকে দেখলাম গুরুদেব সেদিক থেকে পূর্ব মুখে আসছেন। গুরুদেব সাধারণত পশ্চাৎ-নিবদ্ধ হস্তে ধীরে ধীরে আশ্রমের

মধ্যে বিচরণ করতেন। আশ্রমের মধ্যে গুরুদেবকে যে ভঙ্গিতে চলাফেরা করতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, বর্তমানে ফোটোতে রবীন্দ্রনাথের সেই ছবিটি বোধহয় সকলেই দেখেছেন। সেদিন দেখলাম গুরুদেবের বাঁ হাতটি পাশে ঝোলানো আর ডান হাতটি সামনে পাতা এবং হাতের তালুর উপর কিছু যেন আছে। কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করতেই গুরুদেব ডান হাতটি বাড়িয়ে বললেন, "নে ধর্, তোদের কীর্তি ছাখ্।" এই বলে আমাদের একজনের হাতে সন্তর্পণে কতগুলি ভাঙা কাঁচের টুকরো তুলে দিলেন। ঐগুলি তিনি ছেলেদের কোনো আবাসিক গৃহের জানালার পাশে রাস্তার উপর থেকে নিজেই একটি একটি করে কুড়িয়ে এনেছেন। বললেন, "তোদের নিজেদের কিছুটা আলস্য এবং কিছুটা সুবিধার জন্য জানালা দিয়ে বাড়িয়ে এই ভাঙা দোয়াতের কাঁচগুলি রাস্তার উপর ফেলে দিয়েছিস। এতে তোর সুবিধা হল বটে কিন্তু অন্যের যে অসুবিধা হবে বা একটা বিপর্যয় ঘটতে পারে সেটা তোরা কখনও চিন্তা করিস না। এটা আমাদের দেশের লোকের চরিত্রের একটা মস্ত বড় ত্রুটি। সভ্য সমাজে এটা যে একেবারেই চলে না, সে বোধ যে তোদের মধ্যে কবে জাগ্রত হবে জানি না। যা, জগদানন্দর বাড়ির পাশে যে উঁইয়ের ঢিপিটা আছে তার গর্তের মধ্যে এগুলো ফেলে দিয়ে আয়, দেখিস একটি টুকরোও যেন বাইরে না পড়ে।" মাথা নীচু করে গুরুদেবের আদেশ পালন করল ছেলেটি। কোনো রূঢ়

কথা না বলে, কোনো শাস্তি না দিয়ে গুরুদেব আমাদের যে শিক্ষা দিলেন, তা আমাদের মনে চিরদিন গাঁথা হয়ে রইল।

১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে আশ্রমবিদ্যালয়ে তখন পূজাবকাশ চলছে। গুরুদেব সেই সময় আশ্রমেই ছিলেন। দেহলীতে থাকতেন তিনি। পরের বছরের গোড়াতেই আমাদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা বলে আমাদের সেবার পূজার ছুটিতে বাড়িতে যেতে দেওয়া হয় নি। আমি দিন দশেকের জন্য মুঙ্গেরে আমার জ্যাঠামশায়ের কাছে গিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে ফিরে এসেছি। দেহলী সংলগ্ন নতুন বাড়ির পশ্চিম দিকের ঘরটায় আমরা থাকতাম। আমার মা তখন দেশে গিয়েছিলেন, বাবা আমাকে নিয়ে তাঁর সেই আবাসিক গৃহে ছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশনের ছাত্ররা বীথিকাগৃহ এবং বাগানবাড়ি মিলিয়ে ছিলেন। সবাইকে নেপালবাবু এবং জগদানন্দবাবুর কাছাকাছি থাকতে হত। তাঁরা আমাদের যথাক্রমে ইংরেজি ও অঙ্ক করাতেন। একদিন রাত্রি প্রায় দশটা হবে—আমি আমাদের সংস্কৃত পাঠ্য মহাভারত পড়ছিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে নোট বই থেকে ইংরেজি অনুবাদ মুখস্থ করছিলাম। এই পড়ার সময় বেশ একটু 'ক্র্যামিং' করেই পড়ছিলাম। যথা—"যদাশ্রৌশম্ পাণ্ডুপুত্রানাম্ যেসাম্ রক্ষে জনার্দ্দন তদানাসংশয় বিজয় সঞ্জয়।" "O ! Sanjoy, when I heard that Lord Krishna himself is giving protection to the sons of Pandu I gave up all hopes of victory." এমন সময়

বাইরে থেকে কে যেন আমাকে ভেঙিয়ে বলল—“যদাশ্রৌসম্, যদাশ্রৌসম্—ও কী হচ্ছে ?” সামনে তাকিয়ে দেখি অন্ধকারে লম্বা খাড়া কে একজন দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমটা একটু চমকে গিয়েছিলাম বটে তবে কণ্ঠস্বর শুনে গুরুদেবকে চিনতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নি। তাড়াতাড়ি ঘরের দরজাটি খুলে দেহলী যাবার পথে এসে দাঁড়ালাম। গুরুদেবও ততক্ষণে শালবীথি ছেড়ে আমাদের বাড়ির সামনে দেহলী যাবার রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কী পড়ছিলি ?” বললাম। গুরুদেব বললেন, “ঐ রকম কদর্যভাবে সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত পড়ে নাকি কেউ ? কাল সকালে আমার কাছে যাস্, কী করে সংস্কৃত মহাভারত পড়তে হয় আমি শিখিয়ে দেব। বাংলায় মানে বুঝিয়ে দিলে নিজেই তার অনুবাদ করতে পারবি। এতদিন ধরে তোদের নিয়ে অনুবাদচর্চা করলাম আর এই মহাভারতের কথাগুলো অনুবাদ করতে পারবি না ?” কিন্তু গুরুদেবের কাছে আর আমার যাওয়া হয় নি। সেই রাত্রেই আমি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হলাম। আমার বাবা একটু ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের কাছ থেকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এনে খাইয়ে দিলেন। তার পরদিনও জ্বর কমল না। তিন-চার বার আমাদের ঘরে এসে গুরুদেব আমায় দেখে যাচ্ছিলেন এবং মাঝে মাঝে ওষুধও বদলে দিচ্ছিলেন। বলতে গেলে তখন গুরুদেবের চিকিৎসাধীনেই আমি ছিলাম। তিন-চার

দিন কেটে গেলে রোগের যখন কোনো উপশম হল না, গুরুদেব তখন নিজেই একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। একদিন ভোরে এসে বাবাকে বললেন, “ওকে আজকেই কলকাতা নিয়ে যান।” আমার সহপাঠী বীরেনকে ডেকে একটা সেকেণ্ড ক্লাস কুপে রিজার্ভ করার নির্দেশ দিলেন। কম্পাউণ্ডার যোগেন-বাবুকে আমাদের সঙ্গে দিলেন—যদি পথে কোনো শুশ্রূষার প্রয়োজন হয়। এমনই সব দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কালীমোহনবাবুরা তখন আমাদের প্রতিবেশী। তাঁর স্ত্রী মনোরমাদি বাবাকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিলেন এবং আমাকেও হরলিক্স্ তৈরি করে পথ্য দিলেন। আশ্রমে সবাই যেন আমরা একই পরিবারের মানুষ ছিলাম। আমাকে নিয়ে বাবা ও যোগেনবাবু কলকাতায় রওনা হলেন। আমার সহপাঠীরা সব বিদায় জানাতে স্টেশন অবধি সঙ্গে এল। আমার চিকিৎসার ব্যাপারে মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র বিশুদা, হরগোবিন্দদা প্রভৃতি বাবাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। এঁদের সকলের আন্তরিক শুশ্রূষায় এবং গুরুদেবের আশীর্বাদে আমি সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিলাম। তখন কলকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জার এপিডেমিক লেগেছে। গ্রে স্ট্রীটের উপরে ছিল আমাদের বাড়ি। গভীর রাত্রে রাস্তা থেকে কেবলই ভেসে আসত মৃতদেহ বহন করে নিয়ে শ্মশানের পথে যাওয়ার আওয়াজ ‘বল হরি, হরিবোল’। ভয়ে আতঙ্কে রাত্রে যখন ঘুম হত না তখন স্মরণ করতাম গুরুদেবের দেওয়া সেই সবিতা

মন্ত্র—'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'। বার বার উচ্চারণ করতে করতে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়তাম।

রবীন্দ্রনাথ ও নেপালচন্দ্র

আমার কথা শেষ হয়ে এল। আমার মনের মধ্যে আজও যে স্মৃতিটি সবচেয়ে পবিত্র ও উজ্জ্বল তা হল আমার জীবনের দুই পরমারাধ্য পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের স্মৃতি। একজন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, অপরজন আমার পিতৃদেব আজীবন শিক্ষাব্রতী নেপালচন্দ্র রায়।

গুরুদেবের মহত্ত্ব ও বিনয়ের তুলনা ছিল না। আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা—কেবল প্রতিষ্ঠাতা নন, তাঁর বিদ্যালয়ের যাবতীয় আর্থিক দায়িত্ব, মঙ্গলামঙ্গলের ভার তাঁর একার উপরেই ছিল। অথচ অধীনস্থ সহযোগী শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি তাঁর যে কী উদার ও সবিনয় ব্যবহার ছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। গুরুদেবের তিরোধানের বেশ কিছু পরে শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে শিক্ষক তৈরির একটি মহা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তার নামকরণ করেছিলেন 'বিনয় ভবন'। আমার বদ্ধমূল ধারণা যে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ বিনয় স্মরণ করেই তিনি এই নামকরণ করেছিলেন। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর বিলেত যাবার কিছু আগে অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়কে গুরুদেব তাঁর

দীর্ঘ অনুপস্থিতির কালে বিদ্যালয় পরিচালনা প্রসঙ্গে একখানি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। সেই মূল্যবান চিঠিখানির একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

"……আমি অন্তত কিছুদিনের জন্য দূরে যাইতে প্রস্তুত হইতেছি। এই সময়ে আমি আপনাদের সকলের কাছ হইতে অন্তরের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি। অনেক সময়ে অবিবেচনা করিয়া আপনাদের কাছে অনেক অপরাধ করিয়াছি; অবিচারে অনেক বেদনার কারণ ঘটাইয়াছি; আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ঈর্ষাবিদ্বেষের তরঙ্গ মাঝে মাঝে দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে আমি তাহাকে শান্ত না করিয়া অনেক সময়ে ক্ষোভের উপর ক্ষোভ বাড়াইয়াছি; আজ বিদায়গ্রহণের সময় আমার সেই সমস্ত এবং অন্যান্য গোচর ও অগোচর পাপ মার্জনা করিবেন।

আমি প্রথম হইতেই ইহা নিশ্চয় জানি মানুষকে চালনা করিবার শক্তি আমার নাই; সকলের হৃদয়কে সম্মিলিত করিতে আমি পারি নাই; আমার আহ্বানের মধ্যে সত্যের পূর্ণ তেজ নাই—বস্তুত বিদ্যালয়ের সৃষ্টিকার্যে বিধাতা আমাকে নিতান্তই একটি উপলক্ষ্য করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছেন। এখানে আপনাদের যাঁহার যে শক্তি আছে তাহাই মিলাইয়া তুলিয়া যথার্থভাবে ইহার সৃষ্টির ভার আপনারা গ্রহণ করুন—আমার দ্বারা ইহার মধ্যে যাহাতে

কোন বিক্ষেপ উপস্থিত না হয় আমি সেজন্য সতর্ক থাকিব।...

নেপালচন্দ্র রায় ছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের তদানীন্তন শিক্ষকদের মধ্যে প্রবীণতম। সুতরাং তাঁকে উপলক্ষ করে অধ্যাপকমণ্ডলীর সকলেরই উদ্দেশ্যে গুরুদেবের এই অপূর্ব চিঠিখানি লেখা হয়েছিল।

আমার পিতার কথা একটু বলি। তিনি ছিলেন দীক্ষিত ব্রাহ্ম। ১৮৯০ সালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁরই জীবন ও আদর্শের আকর্ষণে নেপালচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বেশ প্রবীণ বয়সে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষকতা করতে আসেন। তার আগে একুশ বছর তিনি বিভিন্ন স্কুলে হেডমাস্টারী করেছেন। ছাত্র-দরদী হলেও তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা-প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর নিজস্ব কতকগুলি অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

মাত্র ছমাসের জন্য উঁচু ক্লাসগুলিতে ইংরেজি ও ইতিহাস পড়াবার প্রয়োজনে তাঁকে আনা হয়েছিল। অথচ কী জাদু ছিল শান্তিনিকেতনের জল-হাওয়ায়, এই ভিন্ন শিক্ষণরীতিতে অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী মানুষটি সেখানে বাঁধা পড়ে গেলেন ছাব্বিশটি বছর। সত্তর বছর বয়সে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর কাজ থেকে অবসরগ্রহণ করার পরেও বিশ্ব-

ভারতীকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেবা করে গেছেন।

শান্তিনিকেতনে চিরকাল তিনি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতেন। এইখানেই তিনি যেন তাঁর কাজের যোগ্য স্থানটি খুঁজে পেয়েছিলেন। এই শান্তিনিকেতন ছিল তাঁর শেষজীবনের সাধনভূমি। প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মানুষটি তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিপূর্ণ নির্ভীক সমালোচনার দ্বারা সকলকে প্রভাবিত করতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথও বাদ যেতেন না। তবুও তিনি কারও অপ্রিয় হননি। সবাই তাঁর বিচক্ষণতার জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, সবাই জানতেন নেপালচন্দ্র 'জী হুজুর' করবার লোক নন।

গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য সুন্দর বোঝাপড়ার সম্পর্ক ছিল। নেপালচন্দ্র এসেই যে পুরোনো ব্যবস্থা বদলে নীচের দিকের ক্লাসেও শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তন করেছিলেন গুরুদেব সেটা মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু একই ছেলে যোগ্যতা হিসেবে বিভিন্ন ক্লাসে পড়বে সেটা কিন্তু নেপালচন্দ্রকেও মেনে নিতে হয়েছিল। গুরুদেব শিক্ষা সম্বন্ধে নেপালচন্দ্রের মতামতকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে। বিভিন্ন সময় গুরুদেবের মন্ত্রণাসভায় তিনি একজন অপরিহার্য সদস্য ছিলেন। নেপালচন্দ্র বিদ্যালয়ে অভিনয়ের জন্য ক্লাস বন্ধ করে রিহার্সাল পরিচালনা করা অপছন্দ করতেন। গুরুদেব সেটা জানতেন। উপরোক্ত চিঠিখানিতে যেন তারই

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর একবার একখানি চিঠিতে তিনি নেপালচন্দ্রকে লিখছেন, "আমি তো নিজেই নানা উপলক্ষ্যে কাজের মধ্যে ফাঁক পড়িয়ে থাকি। পূর্বে এ সম্বন্ধে কোনোদিন চিন্তাই করিনি। কতদিন আমোদ বা অভিনয় উপলক্ষ্যে আমি ক্লাস ভেঙে দিয়েছি। কিন্তু তখন আমাদের ছেলে-মেয়েরা আমাদেরই ছিল। হাল আমলে নতুন নতুন আমদানী-বশত সময় বদলে গেছে। সেই কথাই পূর্বোক্ত আলোচনায় আমার মনে প্রথম জাগল।"

নেপালচন্দ্র যখন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় যেতেন তখন তিনি তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁদের কাছে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কথা কত গৌরবের সঙ্গে, কত আশার সঙ্গে বলতেন তা আমিও স্বকর্ণে বহুবার শুনেছি।

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় তাঁর এক বন্ধু তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা এতদিন তো আপনি রবিবাবুর কাছে আছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রকৃত মহত্ত্বের কোনো পরিচয় পেয়েছেন কি?" বিনা দ্বিধায় আমার পিতা উত্তর করেছিলেন, "পেয়েছি বই কি—ভূরি ভূরি পেয়েছি।" প্রসঙ্গত দুএকটি দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে একটি ঘটনা খুব আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন আমার মনে আছে।

অনেক আগেকার কথা। তখন অজিতকুমার চক্রবর্তীর উপর আশ্রমবিদ্যালয়ের ভার ছিল। এই সময় রবীন্দ্রনাথের

যেমন স্বভাব, কোনো এক শিক্ষককে পছন্দ হওয়াতে অজিত-কুমারকে না জানিয়েই বিদ্যালয়ের কাজে তিনি নিযুক্ত করেন। অজিতকুমার বয়সে নবীন হলেও ব্যক্তিত্বে সামান্য ছিলেন না। তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানালেন যে এই ভাবে তাঁদের পক্ষে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করার কোন অর্থ নেই। এবার থেকে তাঁরা শুধুমাত্র গুরুদেবের নির্দেশ মতো কাজ করে যাবেন, নিজেরা কোনো দায়িত্ব নেবেন না। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে নিজের কাজের ত্রুটি স্বীকার করে অজিতকুমারকে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁকে লেখা চিঠিতে এই জাতীয় প্রসঙ্গ অনেক সময়েই এসেছে। একটির উল্লেখ করি।

> তুমি যা লিখেছ সেটা ঠিক। এক-এক সময়ে আমি মুহূর্তের চাঞ্চল্যে যা-তা তখনি বলে ফেলি, এমন কি, করে বসি, সেটা কিছুতেই ঠিক নয়—তাতে অনেক অনিষ্টই ঘটে—বারবার এ রকম হয়েও আমি ভুলে যাই এটা নিতান্তই আমার স্বভাবের দুর্বলতা—এ সম্বন্ধে আমাকে বারংবারই তোমরা সতর্ক করে দিয়ো। আমি চেষ্টা করব এ রকম অবিবেচনা আর যেন না ঘটে। তুমি কিছু মনে করো না। আমার এই দুর্বলতাটা যাতে ঘুচে যায় সে সম্বন্ধে তোমরা আমাকে সাহায্য কোরো। এটা আমার মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। এটাকে সংশোধন করতেই হবে। [জুলাই, ১৯০৯]

কবি রবীন্দ্রনাথের বন্দনা করেছে সারা বিশ্ব। ভাবতে আজও অবাক লাগে সেই মানুষ ছিলেন আমার গুরু, আমার শিক্ষক, আমার নিকটাত্মীয়। আমাদের দেশে গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা করবার রীতি বহুল প্রচলিত। আমিও সেই রীতির অনুসারী হয়ে কবির নিজেরই রচিত ছন্দে তাঁর জয়গাথা গেয়ে তাঁর প্রতি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করে এই ক্ষুদ্র লেখাটি শেষ করলাম :

জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি,
জয় তোমার করুণা।
জয় তব ভীষণ সব-কলুষ-নাশন রুদ্রতা।
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব,
জয় শোক তব, জয় সান্ত্বনা॥
জয় পূর্ণজাগ্রত জ্যোতি তব,
জয় তিমির নিবিড় নিশীথিনী ভয়দায়িনী।
জয় প্রেমমধুময় মিলন তব, জয় অসহ বিচ্ছেদ বেদনা॥

২৭শে কার্তিক ১৩০৯ কুঞ্জলাল ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম কার্যপ্রণালীটি বিধৃত আছে।

বিনয় সম্ভাষণমেতৎ—

আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পণ করিয়াছি আপনি তাহা ব্রত স্বরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ো আনন্দলাভ করিয়াছি। একান্ত মনে কামনা করি ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রত পালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি, বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নয়, পরমার্থ— ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে— সংযমের দ্বারা, ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা, শুচিতা দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগসাধনার জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্যব্রত।

ইহা ধর্মব্রত। পৃথিবীতে অনেক জিনিসই কেনাবেচার সামগ্রী বটে, কিন্তু ধর্ম পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না।

এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিস দিতেন যাহা গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দান প্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য যত উচ্চ হইবে তাহার উপায়ও তত দুরূহ ও দুর্লভ হইবে। এ সব কার্য ফরমাশমতো চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায়, গুরু সহজে পাওয়া যায় না। এই জন্য যথাসম্ভব লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধৈর্যের সহিত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যতটা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া নিজেকে প্রত্যহ সাধনার পথে অগ্রসর করিতে হইবে।

মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ-অশান্তির জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হয়—অনেক অন্যায় আঘাতও ধৈর্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও কল্যাণভাবের দ্বারা সমস্ত বিরোধ বিপ্লবকে জয় করিতে হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান করিতে চাই। পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে—তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষা-স্থানে দেবতার

বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা—এমনকি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনো সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব—নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না—অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।

ব্রহ্মচর্য-ব্রতে ছাত্রদিগকে কাঠিন্য অভ্যাস করিতে হইবে। বিলাস ও ধনাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই। যেখানে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা যাইবে সেখানে তাহা একেবারে নষ্ট করা কর্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে······র পুত্র······র শৌখিন দ্রব্যের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে—সেটা দমন করিতে হইবে। কেহ দারিদ্র্যকে যেন লজ্জাজনক ঘৃণাজনক না মনে করে। অশনে বসনেও শৌখিনতা দূর করা চাই।

দ্বিতীয়ত নিষ্ঠা। উঠা বসা পড়া লেখা স্নান আহার ও সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ম একান্ত

দৃঢ়তার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শয্যায় বসনে ও শরীরে কোনোপ্রকার মলিনতা প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। যেখানে কোনো ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে সে যেন কাপড় কাচা সাবান দিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ নিজের কাপড় কাচে ও ব্যবহার্য গাড়ু মাজিয়া পরিষ্কার রাখে এবং ঘরের যে অংশে তাহার বিছানা কাপড় চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সে অংশে যেন প্রত্যহ যথা সময়ে যথা নিয়মে পরিষ্কার তক্‌তকে করিয়া রাখে। ছেলেরা প্রত্যহ পর্যায়ক্রমে তাহাদের অধ্যাপকদের ঘরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভালো হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত করা চাই।

তৃতীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। কোনোমতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোনো ছাত্র উপস্থিত না থাকে তৎ প্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কোনো অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষ প্রকাশ না করেন সে দিকে সকলের মনোযোগ থাকা কর্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপক-দিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান থাকে।

বিলাসত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকূল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।

যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান তাহাদিগকে কোনো প্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ। রন্ধনশালায় বা আহারস্থানে হিন্দু আচার বিরুদ্ধ কোনো অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।

আহ্নিক। ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র মুখস্থ করাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমি যে ভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম ঃ—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—

এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারি দিক হইতে আরহণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যান কালে ভূলোক ভূবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে—তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি —আমি এখন কেবলমাত্র কোনো বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে, মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে

এই প্রতি মুহূর্তেই তাহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃ স্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুণ আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি —সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে অন্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম রূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকের সবিতারূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিত ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ— ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রী মন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তরের যোগসাধন করে— এই জন্যই আর্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ, এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এই জন্য গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।

ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে সকলে সমস্বরে ওঁ পিতানোঽসি উচ্চারণপূর্বক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা, এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যহ স্মরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞান শিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্বপ্রকার পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়, সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়— সেইজন্যই ঐ মন্ত্রে আছে—

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—
যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।

'হে দেব, হে পিত, আমাদের সমস্ত পাপ দূর কর, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ কর।'

ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকলপ্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্মল করিবার জন্য মনুষ্যত্ব-লাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র—

যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।

বক্তৃতাদিতে অনেক সময়েই চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাত্ম-সাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের অভ্যাস মাদক সেবনের ন্যায় চিত্তদৌর্বল্য-জনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এই সকল মন্ত্রের মধ্যে ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায়— ইহারা কোথাও যেন বাধা দেয় না। এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্থ কথার মতো না হইয়া যায় সেজন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। কিছু-কাল আমার অনুপস্থিতিবশত নূতন ছাত্রদিগকে মন্ত্র বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার সঙ্গে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইবেন, তাহাদিগকে যদি আহ্নিকের জন্য উপনিষদের কোনো মন্ত্র বুঝাইয়া বলিয়া দেন তো ভালোই হয়।

এক্ষণে আপনার কার্যপ্রণালীর কথা বিবৃত করিয়া বলা যাক। মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দবাবু ও সুবোধবাবুকে লইয়া

একটি সমিতি স্থাপিত হইবে। মনোরঞ্জনবাবু তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দেশমতে বিদ্যালয়ের কার্য-সম্পাদন করিতে থাকিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান স্নান আহ্নিক আহার পড়া লেখা ও শয়ন সম্বন্ধে কাল নির্ধারণ তাঁহারা করিয়া দিবেন— যাহাতে সেই নিময় পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।

বিদ্যালয়ের ভৃত্যনিয়োগ, তাহাদের বেতন নির্ধারণ বা তাহা-দিগকে অবসর দান, তাঁহাদের পরামর্শমতো আপনি করিবেন।

মাস শেষে আগামী মাসের একটি আনুমানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন।

খাতায় প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহের হিসাব ও মাসান্তে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ আমাকে দিতে হইবে।

সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্তন খাতায় লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন।

সায়াহ্নে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মন্তব্য জানাইবেন ও খাতায় সহি লইবেন।

ভাণ্ডারের ভার আপনার উপর। জিনিসপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মায় থাকিবে। জিনিসপত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোনো জিনিস

নষ্ট হইলে হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ তাহা জমা খরচ করিয়া লইবেন।

আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্যবেক্ষণ করিবেন।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

তাহাদের জিনিসপত্রের পারিপাট্য, তাহাদের ঘর শরীর ও বেশভূষার নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগী হইবেন।

ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিতিকে জানাইয়া তাহা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে রান্নাঘরে ও তাহার চতুর্দিকে, পায়খানার কাছে কোনোরূপ অপরিষ্কার না থাকে আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

গোশালায় গরু মহিষ ও তাহাদের খাদ্যের ও ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ফুল ও তরকারির বাগান আপনার হাতে। সেজন্য বীজ ক্রয়, সার সংগ্রহ ও মধ্যে মধ্যে ঠিকা লোক নিয়োগ সমিতিকে জানাইয়া করিতে পারিবেন।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংস্রব প্রার্থনীয় নহে। জিনিসপত্র ক্রয়, বাজার করা ও বাগান তৈরির সহায়তায় মাঝে মাঝে আশ্রমের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু অন্যান্য ভৃত্যদের সহিত যোগরক্ষা না করাই শ্রেয়।

ঠিকা লোক প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে সর্দারকে বা মালীদিগকে, রবীন্দ্র সিংহকে বা তাহার সহকারীকে জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।

শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে রোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিবেন। যে যে ঔষধের যথা প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিয়া দিলে আমি আনাইয়া নিব।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমসম্পর্কীয় কেহ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে বা সেখানকার ভৃত্যদের কোনো দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্বপ্রকার স্বচ্ছন্দতার জন্য আপনি বিশেষরূপ মনযোগী হইবেন।

মনোরঞ্জনবাবু ও শিক্ষকদের বিনা অনুমতিতে শান্তি-নিকেতনের অতিথি-অভ্যাগতগণ স্কুল পরিদর্শন বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।

অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত কোনো ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোথাও যাইতে দিবেন না।

বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না।

অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন—আপনি সমিতিকে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।

আহারাদির ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের

সমক্ষে বা ভৃত্যদের নিকটে তাহার কোনো আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন, আপনি সমিতির নিকট তাঁহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোস্টকার্ড লেখে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বন্ধ-চিঠি লেখা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবেন।

পোস্টকার্ড কাগজ কলম বহি প্রভৃতি কেনার হিসাব রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সমিতি, বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীয় বিষয় যাহা স্থির করিবেন আপনি তাহা তাঁহাদিগকে পত্রের দ্বারা জানাইবেন।

কোনো বিশেষ ছাত্র সম্বন্ধে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিকে জানাইয়া আপনি তাহা প্রবর্তন করিবেন।

কোনো ছাত্রের অভিভাবক কোনো বিশেষ খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে অন্য ছাত্রদিগকে না দিয়া তাহা একজনকে খাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

গোশালায় গরু-মহিষ যে দুধ দিবে তাহা ছাত্রদের কুলাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন, এ নিয়ম অপানার অবগতির জন্য লিখিলাম।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোনো বই

পড়িতে লইলে তাহা যথাসময়ে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

কাহাকেও কলিকাতায় বই লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমার বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

মাসের মধ্যে একদিন থালা ঘটিবাটি প্রভৃতি জিনিসপত্র গণনা করিয়া লইবেন।

ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জনবাবুর অনুমতি লইয়া নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

উপস্থিতমতো এই নিয়মগুলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমশ আবশ্যকমতো ইহার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইবে।

কিন্তু প্রধানত নিয়মেয় সাহায্যেই বিদ্যালয়-চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কলমাত্র নহে। স্বত-উৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্যই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোনো অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুণ্যকর্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়া জানি। বিদ্যালয়ের কর্ম যেমন

আমার, তেমনি তাঁহাদেরও কর্ম— এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা।

আমি যে ভাবোৎসাহের প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক মানসিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ের কর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি, সেই ভাবাবেগ আমি সকলের কাছে আশা করি না। অনতিকাল পূর্বে এমন সময় ছিল যখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আশা করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য-ব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা-সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা—ইহাই ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।

কিন্তু এই মত ও এই আগ্রহ আমি যদি অন্যের মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি তবে সে আমার অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য— অন্যকে সেজন্য আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জোর করিয়া কাহারও উপর চাপানো যায় না— এবং এ সকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্বাপেক্ষা হেয়।

আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অনুষ্ঠিত ব্যাপারের সমস্ত ত্রুটি দৈন্য অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে

পাই ; বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি—সেইজন্য সমস্ত খণ্ডতা দীনতা সত্ত্বেও ভাবের তুলনায় কর্মের যথেষ্ট অসংগতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না। যিনি আমার কাজকে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতিদিনের মধ্যে বর্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধা বিরোধ ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন, তাঁহার উৎসাহ আশা সর্বদা সজাগ না থাকিতে পারে। সেইজন্য আমি কাহারো কাছে বেশী কিছু দাবি করি না, সর্বদা আমার উদ্দেশ্য লইয়া অন্যকে বলপূর্বক উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি না— কালের উপরে, সত্যের উপরে, বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ধৈর্যের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেজনায়, কতক লজ্জায়, কতক ভাবাবেগে, কতক অনুকরণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কুফল উৎপন্ন হয়।

আমি আশা করিয়া আছি যে, অধ্যাপকগণ, আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণ বীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির

পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত, অবিচার, অধৈর্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র বা ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা ছোটখাটো অভ্যাসদোষ এ সমস্ত প্রতি-দিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে—এবং ব্রহ্মচর্য আশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শিখে।

আমার ইচ্ছা গুরুদের সেবা, অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্যে রথীর দ্বারা বিদ্যালয়ে আদর্শ স্থাপন করা হয়। এ সমস্ত কার্যে যথার্থ গৌরব আছে, অপমান নাই— এই কথা যেন ছাত্রদের মনে মুদ্রিত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এই সমস্ত সেবাকার্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যা-গতদের অভিবাদন, তাঁহাদের সহিত শিষ্টালাপ ও তাঁহাদের প্রতি সযত্ন ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষ রূপে শিক্ষা করানো হয়। বিদ্যালয়ের নিকট কোনো আগন্তুক উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে শেখে—ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শুশ্রূষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়। ভৃত্যদের যত অল্প কাজ করানো

যাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আপনি যদি সংগত ও সুবিধাজনক মনে করন তবে গোশালার গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে অর্পণ করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে, ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভালো হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাখি মাছ ও ছোট জন্তু আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাখি খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্যের সহিত মুক্ত পাখিদিগকে বশ করানোই ভালো। শান্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা আশ্রয় লইয়াছে, চেষ্টা করলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালিদিগকে বশ করাইতে পারে। লাইব্রেরি গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা এ সমস্ত কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের প্রতিই অর্পণ করা উচিত জানিবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোনো বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এনট্রেন্স পরীক্ষার ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর কোনো ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়স্ক ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা যেন যথাসময়ে স্বহস্তে হোরিকে পরিবেশন করে। প্রাতঃকালে তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়—যথাসময়ে তাহার তত্ত্ব লইতে থাকে—নাবার ঘরে ভৃত্যেরা তাহার আবশ্যক মতো জল দিয়াছে কিনা পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম

দুই-একদিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্য ছাত্ররা কোনোপ্রকার সংকোচ অনুভব করিবে না।

ছাত্রেরা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেশন করিলে ভালো হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেশক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্তব্য হইবে।

রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভালো হয়।

সম্প্রতি নানা উদ্‌বেগের মধ্যে আছি, এজন্য সকল কথা ভালোরূপ চিন্তা করিয়া লিখিতে পারিলাম না। আপনি সেখানকার কাজে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে, তখন অধ্যাপকগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানাইবেন।

আপনার প্রতি আমার কোনো আদেশ নির্দেশ নাই; আপনি সমবেদনার দ্বারা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়ের ভাব অনুভব করিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত কল্যাণকামনার দ্বারা কর্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে ধরা দিবেন এবং

যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

ইতি ২৭শে কার্তিক ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[“শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম” থেকে গৃহীত। রবীন্দ্ররচনাবলী ২৭]